মৃত্যু ও জন্মান্তর-প্রসঙ্গ

শ্রীমৎ অনির্বাণ

ওভারম্যান ফাউন্ডেশন

প্রকাশক :
অনুরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়
ওভারম্যান ফাউন্ডেশন
২৩৫/১/২এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস রোড,
কলকাতা ৭০০০৪৭
ফোন : ৯৮৩০২৪৪১৯২, ৯৮৭৪০১১২২৪
Email : overmanfoundation@gmail.com, overmanfoundationoffice@gmail.com

সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ :
৮ জুলাই ২০১৮

প্রচ্ছদ, অক্ষর বিন্যাস :
ওভারম্যান ফাউন্ডেশন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক :
ওভারম্যান ফাউন্ডেশন

ISBN : 978-93-83165-54-2

মূল্য : ১৫০ টাকা

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	১
মৃত্যু	২
জন্মান্তর-প্রসঙ্গ	৭৬
লেখক-পরিচিতি	৮৮
সংকেত-সূত্র	৮৯

মুখবন্ধ

জীবন ও মরণ শাশ্বত-সত্তাভূত ধ্রুবছন্দের দুটি মাত্রা — একটিতে শুরু, অপরটিতে সারা । রূপসী শব্দময় জীবনের মাধুরী রূপায়িত হয় অরূপের নিঃশব্দ শূন্যকায়ায় ; মরণ তাই জীবনের অরূপবিগ্রহ । জীবন বিশেষ্যের রূপকথন, মরণ বিশেষণবিহীন আকাশসুন্দরী — দু'য়ে মিলে অপরূপ মিলনবীথি । জীবনের রূপ সোমময়, তাকে পান করেই পরিপূর্ণ হওয়া, সেই পূর্ণতা হল মরণকে বরণ করার প্রস্তুতিপর্ব — পরম শূন্যতার মাঝে মহাপূর্ণতার প্রণয়বাসরকে সার্থক করার সন্ধিক্ষণ 'মরণ' ; 'জীবন' তারই অন্তরঙ্গ সাধন । এই দুই ত্রি-অক্ষরা সুন্দরীর যুগনদ্ধতায় মৃত্যু-সৌন্দর্যের আস্বাদনেই জীবনের পরম সার্থকতা ।

মৃত্যুদেবতার কাছে কিশোর নচিকেতার প্রশ্ন — মৃত্যু কী ? মৃত্যুর কাছেই মৃত্যু-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ! এ যেমন আশ্চর্য, তেমনি আশ্চর্যময় সেই মৃত্যু-দেবতার উত্তর । কঠোপনিষদের সমগ্র চিন্তাচিত্রটি সম্পূর্ণভাবে দিব্যজীবন গড়ে তোলার সাধন-বৃত্তান্ত — জীবনের জয়গীতই হল মৃত্যুদেবতার চরম উত্তর । তাই দিব্যজীবনের প্রথম সাধন মৃত্যুভাবনা । মৃত্যু-তত্ত্বের মাঝেই আছে জীবনের তত্ত্ব ।

ভারতবর্ষের মৃত্যুতত্ত্ব-অন্বেষণের ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি কঠোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, কৌষিতকী উপনিষদ, শিবসংহিতা ইত্যাদি । সেই সব আশ্চর্য-অমূল্য সাধনবিবৃতি সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ জটিল ও কষ্টসাধ্য প্রয়াস হলেও শ্রীমৎ অনির্বাণের প্রজ্ঞাঘন সৌরদৃষ্টিতে সেই মৃত্যুতত্ত্ব সুগম ও স্বচ্ছরূপে প্রকাশিত । আগম ও নিগম-বিষয়ক তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় তিনি অবতারকল্প ব্যাখ্যাতা, বাংলাভাষার ব্যাসদেব — তাঁর সৃষ্টিসম্ভার বাংলার নব-মহাভারত । তথ্য হতে তত্ত্বে অবগাহন আর তত্ত্বাবগাহন করে তথ্যকে জলধারার মতো তরলায়িত করার প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টির সরলতা ও স্পষ্টতার অসামান্য রূপায়ণে তিনি অভিনব বাল্মীকি — তাঁর দৃষ্টিসম্ভার বাংলার নব-রামায়ণ । তাঁর দৃষ্টি-সৃষ্টির সম্ভার হতে একটি মুক্তামালা হল আলোচ্য গ্রন্থটি — 'মৃত্যু ও জন্মান্তর-প্রসঙ্গ' ।

মৃত্যুতত্ত্বে নিষ্ণাত হয়ে মৃত্যুস্বরূপ বিজ্ঞানচেতনার সৌরকরোজ্জ্বল আকাশব্যাপী মহাচৈতন্যকে শ্রীমৎ অনির্বাণ বিবৃত করেছেন তাঁর অমর বাণীশক্তির মাধ্যমে — তাইতে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব 'মৃত্যু-মীমাংসা' । মৃত্যুতত্ত্বের সমস্ত জটিলতাকে তিনি তাঁর স্ব-সংবেদ্য-অনুভবের বাক্‌রূপী প্রকাশে সহজ করে ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের জীবনজিজ্ঞাসা তথা মৃত্যুজিজ্ঞাসা ।

শ্রীমৎ অনির্বাণের লিখিত পত্রাবলী ও দিনলিপি হতে গ্রন্থটি সঙ্কলিত অবয়বে উপস্থাপিত করা হয়েছে ।

ওভারম্যান ফাউন্ডেশনের তরুণ কর্ণধার অনুরাগ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহে গ্রন্থটি প্রকাশিত হল । পাঠকচিত্তের গভীর মননের সহায়করূপে প্রতিভাত হলে এই সঙ্কলনটির সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে ।

৮ জুলাই ২০১৮
কলকাতা

যুগ্ম-সম্পাদক
সঞ্জয় বিশ্বাস ও ব্রততি মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু

ভারতবর্ষের দুঃখবাদ একটা বলিষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ । এ-দুঃখ বঞ্চনা থেকে আসেনি, এ নির্ঘাত সত্য । বাসনার অপরিতৃপ্তিতে একরকম দুঃখ আছে, ভারতবর্ষ তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি । তার দুঃখের মূলে আছে অপরিতৃপ্ত জিজ্ঞাসার দুঃখ । 'আত্মানং খিলং মন্যে' — আমার সবই আছে, তবু আমাকে আমি স্বস্থ পূর্ণ মনে করতে পারছি না । বেদের ভাষায়, আমরা চলেছি 'নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চ অসুতৃপা' — কুয়াসায় দৃষ্টি আমাদের আবৃত, শুধু প্রাণের ক্ষুদ্রতৃপ্তি নিয়ে কলরব করছি : এই আমাদের দুঃখ । এ-দুঃখ কবিহৃদয়ের বেদনা, আত্মপ্রসারের আকূতি । এইজন্য এ-দুঃখের একটা সনাতন রূপ আছে আমাদের দেশে । ভোগৈশ্বর্যের চরমে পৌঁছেও এদেশের আত্মা মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেছে —

'যৎ নু বিত্তেন পূর্ণেয়ং বসুধা স্যাৎ কথম্ অহম্ অমৃতা স্যাম্ ?'

অতএব ভারতবর্ষের দুঃখবাদ জীবনের পরাভব হতে উদ্ভূত নয় । অতি সুস্থ বলিষ্ঠ প্রাণোচ্ছ্বাসে উদ্বেল আত্মার প্রসারণের আকুলতা হতে এই দুঃখ । দু-হাজার বছর ধরে এই দুঃখের ফুল আমরা ফুটিয়ে এসেছি এদেশের বুকে । তখন দুঃখবাদের নাম ছিল অমৃতপিপাসা । সে-পিপাসা জগৎকে প্রত্যাখ্যান করতে বলেনি কোনদিন, চেয়েছে এই পৃথিবীকেই মধুময় করতে । একটা সাধারণ কথার উল্লেখ করছি । 'প্রেত' শব্দের অর্থ আমাদের কাছে সুপরিচিত : পৃথিবীর পিপাসা যাদের মেটেনি সেই বিদেহী দুঃস্থ আত্মাদের আমরা বলি 'প্রেত' । কথাটার মধ্যে মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে আছে । কিন্তু এই 'প্রেত' শব্দ হতে নিষপন্ন 'প্রেত্য' 'প্রেতি' 'প্রৈতি' 'প্রায়' প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ পাচ্ছি বেদে, যাতে ওর মৌলিক অর্থ ছিল বুঝতে পারছি — মৃত্যুকে অতিক্রম করে **এগিয়ে যাওয়া** । মৃত্যুতেই সমস্ত শেষ হয় না, হতে পারে না । মৃত্যুকে জয় করতে হবে, সোমপান করে অমৃত হতে হবে, আঁধারকে পরাভূত করে জ্যোতিষ্মান হতে হবে — এই জীবনে এই আধারে এই পৃথিবীর বুকে । এই যে অনন্ত প্রাণের অসহন আকুলিবিকুলি, এই হল ভারতীয় দুঃখবাদের গোড়ার কথা । অস্পষ্ট অনুভব করছি, আমার চারদিকে একটা অপরিসীম রহস্য নিথর হয়ে আছে । তার স্পন্দন অনুভব করতে চাই আমার বুকে, নইলে আমার প্রাণ বাঁচে না । জ্যোতির সমুদ্রে ডুবে আছি, কিন্তু চোখে আমার এ কোন্ মায়ার আবরণ ! এ-আবরণ ঘোচাবার ব্যাকুলতায় আমার যে হিয়াদগদগি, তা-ই আমার দুঃখবাদের স্বরূপ । এ-দুঃখকে জীবনের ব্যর্থতা বলতে পারি না, এ হল মহত্তর সার্থকতার আকুলতা । এ মৃত্যুর বিভীষিকা দ্বারা দিগ্ধ নয়, প্রবল প্রাণের প্রেরণা হতে এর উদ্ভব । দুঃখের মূলে আছে এক সুগভীর প্রাণপিপাসার উৎস । সেইখান থেকে দার্শনিক চিন্তার দুটি ধারায় এ-এষণা প্রবাহিত হয়েছে ।

*

...আমি জীবনরসিক, কিন্তু জীবনকে আমি জানি মৃত্যুর বুকে বাঁধা । সে-মৃত্যু অমেয়, রাতের তারাভরা আকাশের মত রহস্যময় । আমি তাকে ভালবাসি । তার রহস্যকে জীবনে নামিয়ে আনতে চাই । মৃত্যুতে দুঃখ নাই, কিন্তু জীবনে আছে আনন্দ । একই সত্তার একটা দিক নেতি, আরেকটা দিক ইতি । একটি দুঃখাভাবের মুক্তি, আরেকটা আনন্দের মুক্তি । জীবনটা আমার কাছে অত্যন্ত সত্য । শিশিরবিন্দুর মত সে ঔজ্জ্বল্যের ক্ষণিকা ; কিন্তু ওই ক্ষুদ্র বুকে সে সবিতাকে বেঁধেছে এই তার আনন্দ । এ-আনন্দ একদিন মৃত্যুতে লীন হয়ে যাবে । তারপর কি থাকবে জানিনা — জানতে চাই-ও না । তাকে যদি দুঃখাভাব বল, ঠিকই বলবে ।

*

মৃত্যুর ওপারে আর কিছুই থাকতে পারে না । অবশ্য 'মৃত্যু' এখানে প্রাচীন দার্শনিক অর্থে ব্যবহার করছি । বোধহয় জান, মৃত্যু যে-ধাতু হতে এসেছে, তার দুটা অর্থ : একটা 'নিবে যাওয়া', আরেকটা 'জ্বলে ওঠা' । এই শেষের অর্থ বেদের মরুদ্‌গণে, যাঁরা লোকোত্তর মহাকাশে আলোর ঝড় । উপনিষদে মৃত্যুকে বর্ণনা করা হয়েছে 'হৃদয়ের প্রদ্যোত' বলে । একদিন অনামিকাকে উদ্দেশ করে বলেছিলাম —

'মরণের আসঙ্গরভসে থরথর চেতনা তোমার —
আমি তার শুনিয়াছি বাণীহারা আকুল ক্রন্দন ।
প্রদ্যোতিত হৃদয়ের অগ্রভাগ দিয়ে
আমি যে ছুঁয়েছি তার ধূপছায়া মহাশূন্যতারে ।'

এই মৃত্যুকে বারবার এই জীবন দিয়ে আমার সমস্ত জাগ্রত চেতনা দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি । সুতরাং অকুণ্ঠকণ্ঠে বলতে পারি, মৃত্যুর পর আমার কি হবে আমি জানি । তার বিবৃতি চাও যদি, দিতে পারব না, হেঁয়ালি করতে শুরু করব । বলব, অসীম শূন্যতার বুকে সসীমের পূর্ণতা, বলব, বিনশনের বুকে সরস্বতীর ধারার লুপ্তি ইত্যাদি । এই মৃত্যু আমার জীবনকে ছেয়ে আছে মহানির্বাণরূপে, তার বুকে তেমনি জ্বলছে এক মহা আকূতির অনির্বাণ শিখা । জীবন অনির্বাণ । তারাম্বরা সুন্দরী সে । তার রহস্যের কূল নাই । কিন্তু মরণসমুদ্রের কূল আছে । সে শুধু নেতি, অসম্ভূতি, জ্যোতির্ময় অব্যক্ত : সে আকাশ । তাকে জানা সহজ, কেননা তার কোনও বিশেষণ নাই ।

আত্মা না বলে 'চেতনা' বল যদি, বোঝা সহজ হয় । জাগ্রতে চেতনা জ্বলে ওঠে বস্তুর সংঘাতে, 'চকমকি ঠোকাঠুকি আগুনের প্রায়' । বাইরের বস্তু বা আমার দেহগত কোনও বস্তুর সংঘাতে ভিতরটা জ্বলে উঠল, অমনি অখন্ড সত্তার মধ্যে চিড় পড়ল বিষয় আর বিষয়ীর । বিষয়কে বাইরে ছুঁড়ে দাও, চেতনার জাগ্রত-ভূমি পাবে । ভিতরে টেনে আন, চেতনার স্বপ্নভূমি পাবে ; তারই মধ্যে তোমার কল্পনা আদর্শ কাব্য শিল্প ভালোবাসা ইত্যাদি মনের যত বদহজম । বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ ঘুচে গিয়ে আবার অখন্ড সত্তার একটা অবর্ণ 'আভাস' ফোটে যদি, সুষুপ্তি পাবে । এইটাকে বলি মৃত্যুর মুখোশ । ঠিক এরই সঙ্গে জড়িয়ে, অমাবস্যার উল্টাপিঠের

মত আছে মৃত্যুর একটা উজ্জ্বল রূপ, তা-ই তুরীয় । সেখানেও বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নাই । কিন্তু 'এক আমি'-র জ্বলে ওঠা আছে — বিনা ইন্ধনে জ্বলা । বোঝাতে পারব না, ওটা কি । শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ইত্যাদি বলা হয় বটে তার ব্যাখ্যা করতে, কিন্তু তাতে প্রকৃতিকে ধোপার পাটে আছড়ানো হয় মাত্র, তুরীয়ের বিবৃতি হয় না । তারপর আবার ফুলকাটা শুরু হয় — বস্তুর নয়, ভাবের । অথচ সে-ভাব বস্তুর চাইতে সত্য । তাকে বলে তুরীয়াতীত । সেটা বোঝানো আরও কঠিন । স্বপ্ন থেকে তুরীয়াতীত পর্যন্ত চারটা ভূমির সব অবস্থাকেই জাগ্রতে আনবার সাধনা আমার জীবনসাধনা । সব ফোটে অনুভবরূপে । যার অনুভব, সে আত্মা । তার দেহ আছে কি না বলবার উপায় নাই । সে এক না বহু, তা-ও বলা চলে না ।

*

জীবনে-মরণে আমি খুব তফাত করি না কিন্তু । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটাই সব নয়, তা সত্যি । ওটা হল পশুর জগৎ : ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হয় তাকে বাঁচবার জন্য, তাইতে ওই স্থূল জগৎটার সৃষ্টি । কিন্তু পশু বাঁচে কেন ? তার জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সে অচেতন ; আমরাও দেখি, তার লক্ষ্য একটা সীমার মধ্যে কুন্ডলিত । কিন্তু বলতে পারি, পশুজীবন একটা বৃহত্তর জীবনের ভূমিকা । সে-বৃহত্তরের স্বাদ জেগেছে মানুষের চেতনায় । ইন্দ্রিয়শক্তিতে অনেক পশুর চাইতে সে দুর্বল । কিন্তু একটি জায়গায় পশুকে সে ছাড়িয়ে গেছে — ভাবে । ভাব অনির্বচনীয় । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অর্থ সে । তাই অর্থকে আবার বলতে পারি চেতনার বিলাস । সে-বিলাসের তিনটি পরিচিতি দিয়েছিলেন ঋষিরা : শুদ্ধ অস্তিত্বের অনুভব, প্রকাশের অনুভব, আনন্দের অনুভব — চলতি কথায় সচ্চিদানন্দ । এই অনুভবের কাছে বাইরের জগৎটা খাটো হয়ে যায় । যদিও এ-অনুভবকে চ্যালেঞ্জ করতে সে ছাড়ে না । বাইরের জগৎ চঞ্চল, আমি তার অধিষ্ঠানরূপে অস্তিত্বের অটল সুমেরু । বাইরের জগৎ ইন্দ্রিয়ানুভবের বর্ণচ্ছত্রে বিচিত্র, আমি তার মর্মে একরস অনুভবের শুভ্রচ্ছটা । বাইরের জগৎ সুখ-দুঃখের তীব্রতায় কন্টকিত, আমি অন্তরের প্রশান্ত সমুদ্রে স্বরূপানন্দের বীচিভঙ্গ ।

এই তো মানুষের অনুভবের চরম । এই অনুভবের ভূমিকায় ফুটছে জগৎ, ফুটছে জীবন — তোমারই বুকে অস্তিত্বের নিবিড় আনন্দের বুদ্বুদরূপে । সামনে তা-ই দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু সচ্চিদানন্দেরও গভীরে ডুবি যদি : পাই প্রশান্ত মরণকে । সে-মরণ জীবনের নিষেধ নয়, তার বিধর্তা । অব্যক্তই ব্যক্তের ভূমিকা । এই বোধটি যদি চিত্তের পিছনে নিত্য জেগে থাকে, তাহলে জীবনের আসক্তি শিথিল হয়ে যায়, কিন্তু তার আনন্দ একতিল কমে না । মরণের বুকে তখন চলে জীবনের বিলাস, শিবের বুকে বিদ্যুচ্চঞ্চলা গৌরীর ঝিকিমিকি ।

এই অনুভবের ওপারে আর কিছুই নাই, এক আনন্ত্যের সম্বোধি (intuition of the infinite) ছাড়া । ওতেই আমার বুক ভরে আছে । ঢেলে দিতে চাই অপরের বুকে । কেউ যদি না নেয় তবু না দিয়ে পারি না ।

*

চ্যবন <√ চ্যু — খসে পড়া । আকাশ থেকে জীবতারা খসে পড়েছে মাটির বুকে, সে-ই ‘চ্যবন’ । ফলেন্ এঞ্জেলের কথা মনে পড়িয়ে দেয় । এই চ্যবনের আরেক রূপ নচিকেতা । চ্যবন আবার ফিরে যেতে চায় সেই দ্যুলোকে । বাধা দেহের মৃত্যু, প্রাণের জরা, ‘Forces of decay and death’। চ্যবনের চিরপ্রয়াস, তাকে ছাড়িয়ে যাবে । গেলও । দ্যুলোকের আলো ঝরে পড়ল সৌম্যসুধা হয়ে, চ্যবন হল ‘বিজরো বিমৃত্যুঃ’ । পুরাণে এই কাজে সহায়তা করেছেন সুকন্যা — চ্যবনের শক্তি ।

*

আনন্দের সত্যরূপ ফোটে কখন জান ? ঠিক জীবনের সঙ্গে মরণের সন্ধি হয় যখন । মরণের মুখামুখি না হলে জীবনের অর্থ পুরাপুরি বোঝা যায় না । এখন আমরা দর্শনের যত বুলিই কপচাই না কেন, ভাবের যত ইমারতই গড়ি না কেন, সব অমানিশার অন্ধকারে জোনাকির আলো । এই আলোই আছে, জোনাকির প্রচেষ্টাকেও আমি খাটো করছি না ; কিন্তু বলছি, ওই অন্ধকারকে পুরাপুরি না জানতে পারলে এই আলোকেও বোঝা যায় না ।

তিলে-তিলে মরছি, দেখছি । আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা — এমন-কি আমার শিবসঙ্কল্পের সমস্ত ঐশ্বর্য ‘শান্তেন্ধন ইবানলঃ’ ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে । অথচ আছে এক নির্বর্ণ সত্তা, তার প্রতি কোনও ভাবই পোষণ করা যায় না । সে যে কি তা বলাও চলে না । হঠাৎ যেন জীবনের পাঠ বদল হয়ে গেল । ওই অপ্রমেয় অন্ধকারই আছে, অত্যন্ত জ্বলন্ত জীবন্ত হয়ে আছে । তার থাকাতেই আমি আছি । চেতনার জোনাকি মিটমিট করছে । এই বোধ যে-আশ্বাস আনে, তাতেই জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় । শূন্যের বোধকে পাকা করে তার মধ্যে পূর্ণের ফুলঝুরি কাটা, এই মনে হয় চরম সাধ্যাবধি ।

জীবনকে ভালবেসেছ । এইবার বলি মরণকে একটুখানি ভালবাস । ওর সঙ্গে একটা সোহাগের সম্পর্ক পাতিয়ে লোকে ওকে বলে — ‘মা’ । কিন্তু আমি বলি ও সর্বনাশী । আর সেই সর্বনাশই যেন সত্তার ভিত্তি ।

হয়তো আরেক জন্মে বৌদ্ধ ছিলাম । হয়তো কেন, নিশ্চয় ছিলাম । তাই বৈনাশিক বুদ্ধিটা কিছুতেই ছাড়তে পারি না ।

*

বাউলের একটা গান বারবার মনে পড়ছে : ‘চলে চন্দ্রতারা নিত্যধারা শব্দ কোথাও নাই ।’ এই গভীর নৈঃশব্দ্য সত্তার মর্মস্থলে ; তাই হাজার-বছরের বিবর্তনকেও মনে হয় এই হাতের মুঠায় । এই মৃত্যুতরণ প্রশান্তি, এর তুলনা নাই । তুমি যে আছ, আছ অবিনশ্বর আদিত্যদ্যুতিতে অনির্বাণ হয়ে — এই মুহূর্তে তোমার এই অনুভবই সত্য । আর-সব ওই অনুভবের পর্দায় ছায়ানৃত্য শুধু ।

মায়ার রাজ্যে থেকে মায়াকে বোঝা যায় না । তুমি যদি চাকা হও, তাহলে চলবে বটে, কিন্তু চালাতে তো পারবে না । তার জন্য চাকা থেকে আলাদা হতে হবে ।

এই আলাদা হওয়াই হল সাংখ্যের বিবেক । তার ফলে দ্রষ্টার তুরীয়ে স্বরূপাবস্থান । সেইখান থেকে দেখছি ঘড়ির দোলকের মত জগৎটা দুলছে — ডাইনে জীবনের দিকে, বাঁয়ে মৃত্যুর দিকে । জীবনে আসক্তি, মৃত্যুতে বিরাগ — এই হল চেতনার এক রূপ । আবার জীবনে বিরাগ, মৃত্যুতে আসক্তি — এই হল তার আরেক রূপ । চলতি কথায় একটা সংসার, আরেকটা সন্ন্যাস । সহজের কাছে দুই-ই তুল্যমূল্য, দুই-ই ওই দোলার অন্তর্গত । মাধ্যমিক নাগার্জুন তাই বলেছিলেন, আমার কাছে ভব আর নির্বাণ এক । এ যে কতবড় অনুভব, তা কথায় বোঝানো যায় না । এই সহজের শূন্যতা থেকে জীবন আর মৃত্যু, অবসর্প আর উৎসর্প, আলো আর কালো দুই-ই উৎসারিত হচ্ছে । তা-ই তুমি — তাই-ই তুমি । অস্তিত্বের এই গভীরতাকে যদি এক মুহূর্তের জন্যও বুঝতে পার, তাহলে দেখবে তুমিই সৃষ্টি । সৃষ্টির রহস্য তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে । মনে হবে নিঃশ্বাসের ছন্দের মতই ও সহজ : জীবনের হাঁপানি নয়, মৃত্যুর কুম্ভকও নয়, অথচ দুই-ই কিংবা কিছুই নয় ।

*

নিঃসঙ্গ হওয়া মানেই বৃহৎ হওয়া : 'শুধু তুমিই আছ' একথাটা বলাও বাহুল্য, বরং বলা চলে **'অস্তীত্যুপলভ্যতে'** । বর্ণবিলাসহীন অস্তিত্ব — তা-ই মৃত্যুর মাধুরী । যখন জগতের দিকে দৃষ্টি পড়ে, গীতাকারের ভাষায় অম্লানবদনে বলা চলে, **'নাহং তেষু, তে চ ময়ি'** — আমি কারও কুক্ষিগত নই, কিন্তু সবাইকে পেয়েছি আমার মধ্যে । মনে হবে স্পর্ধার কথা ? অপ্রবুদ্ধ চিত্ত তা-ই ভাববে । কিন্তু এ-কথাই সব উপলব্ধির চরম । যে-আমিতে সবাই আছে, সে কী বিরাট শূন্যতা ! সেই আকাশে সৃষ্টির ফুল ফুটছে — আকাশেরই অতনু তনুর রোমাঞ্চ হয়ে । আর সেই তনুর তনিমাই বহুশোভমানা হৈমবতী উমা ...

অদ্ভুত, অদ্ভুত ... জীবনের চঞ্চল ছায়া ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যায় মৃত্যুর ভাস্বর দ্যুতিতে — যে-মৃত্যু জীবনের শেষ অধ্যায়, উপলব্ধির চরম পর্ব । তখনও 'আমি' জ্বলে — অনির্বাণ দহনেই জ্বলে ; কিন্তু আমি নিবে যাই ।

*

শূন্যতার প্রেমে না পড়লে অস্তিত্বের পরিক্রমা পূর্ণ হয় না । সৌন্দর্য আছে, প্রেম আছে, আনন্দ আছে — এ সবই হল সত্যের ইতির দিক । কিন্তু এসবের আধাররূপে আছে মৃত্যু, আছে রিক্ততা, আছে আকাশ । এমনভাবে আছে যে তাকে ছাড়িয়ে যাবার তোমার উপায় নাই । এই শূন্যতাকে যদি জীবনের পূর্ণতার নিত্য সঙ্গী করতে পারি, তবেই মুক্তি । মাঝে-মাঝে উপোস দিলে তবেই খাওয়ার স্বাদ বোঝা যায় । তারই নাম আহারশুদ্ধি । শূন্যের মধ্যে যে-পূর্ণ, নিদ্রাতে যে-জাগ্রৎ, আকাশের বুকে যে-আলো, সে-ই 'অস্তি' । 'অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ' ।

*

ভারতবর্ষ মৃত্যুকে চেয়েছে সচেতন হয়ে । জীবনের অজস্র উচ্ছলতার মধ্যে হঠাৎ সে বিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে : ঘা খেয়ে নয়, বরং এই বলে যে **'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'**, **'ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'**, **'ন বিত্তেনামৃতস্যাশাস্তি'** । বসন্তপুষ্পাভরণা প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে সে মদন দহন করেছে আগে, তারপর শিবের সংসার পেতেছে । এইজন্য সে পুরুষ । সেদিন পড়লাম, ইওরোপে সবে এবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছে একটু-একটু করে । রোমের প্রফেসর গিনি বলছেন, 'প্রয়োজন বাড়িয়ে যে পজিটিভ ইকনমিক্স্, তা-ই একমাত্র সত্য হবে কেন ? প্রাচ্য জাতিগুলির যে জীবনাদর্শের ভিত্তি প্রয়োজন কমিয়ে নেগেটিভ ইকনমিক্স্-এর উপর, তারও একটা মর্যাদা থাকবে না কেন ?' এই হল বোধোদয়ের সূচনা । ইওরোপ জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে বলে তাকে বলেছি প্রকৃতি । সে বসন্তপুষ্পাভরণে সাজবেই, সে নিজেকে নিয়ে মত্ত থাকবেই । কিন্তু একদিন এই প্রকৃতিকে ভারতবর্ষের পুরুষের গলায় মালা দিতেই হবে । জগতে সেইদিন মহাবীর্যময় দিব্যজীবনের অভ্যুদয় হবে । ইওরোপের প্রকৃতিকে ভারতবর্ষের পুরুষের কাছে নিবেদিতা হতেই হবে, জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্যকে উজ্জ্বল করতে হবে মৃত্যুর দীক্ষায় । ইউটোপিয়া রচবার প্রাণান্তিক প্রয়াস করতে হবে — ওটা প্রকৃতির ধর্ম — এই জেনে যে 'সব ফাঁকি' । এই হল সভ্যতার ক্রমবিকাশে আমার প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের প্রয়োগ ।

*

... তোমার এই আকস্মিক বিপত্তিকেও বীরের মত গ্রহণ করতে হবে । ভয় পেলে চলবে না, আমরা অজানাকেই ভয় করি, মৃত্যুর পর কি হবে, তাই নিয়ে নানা আজগবি কল্পনা আমাদের মনের গভীরে আছে বলে আমরা ভয় পাই ।

কিন্তু জীবনের মাঝে থেকেই তো মৃত্যুকে জানতে হবে, যেমন করেই হ'ক । তার চিন্তা যখন তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো না । নির্ভীক স্থিরদৃষ্টিতে তার পানে তাকাও, তার মুখোস খসে পড়বে ।

নিদ্রা, মৃত্যু, সমাধি আর প্রলয় — চারটাই একই অবস্থা । তুমি ঘুমাতে ভয় পাওনা, মৃত্যুকেই-বা ভয় পাবে কেন ? আমি বহুবার মৃত্যুকে ছুঁয়ে দেখেছি ! তোমায় নিশ্চিত বলতে পারি, তাকে ভয় করবার কিছুই নাই । অজ্ঞানীর পক্ষে তা মহানিদ্রা, জ্ঞানীর পক্ষে মহাজাগরণ, কিন্তু দুই-ই এক নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি ।

এই নিস্তরঙ্গ প্রশান্তির ভাবনাই কর, নিজেকে তার মাঝে এলিয়ে দাও, আত্মসত্তার গভীরে ওই প্রশান্তি ব্যাপ্ত হয়ে যাক । তখন দেখবে, মৃত্যুর ভূমিকাতেই জীবনের খেলা চলছে, ওকে ভয় করবার তো কিছুই নাই ।

জীবনের চরম সার্থকতা কিন্তু ওই প্রশান্তিতে অবগাহনের মধ্যে । এই জন্যই মায়াবাদী সব positive experienceকেই বলেন মায়া । অর্থাৎ তাকে transcend করতে হবে, এই হল পরম সত্য । সুতরাং জীবন ফুরিয়ে গেলেই যে তা অসার্থক হবে তা নয়, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সচেতন থাকব, প্রশান্ত থাকব — এইটাই আসল কথা ।

*

পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা আর চেতনার কোনও লোকোত্তর ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া একই কথা। শেষের ভাবনাটাই সুষ্ঠু, কেননা তার মধ্যে personality conceptএর ন্যূনতাটুকু থাকেনা। কিন্তু Impersonalএর ধারণা ইওরোপীয় মনের পক্ষে বড় কঠিন ঠেকে দেখেছি। তাই সব-কিছুই তারা personalityর standpoint থেকে ব্যাখ্যা করে। তাই ওদেশে Seanceএর এত ছড়াছড়ি। ওগুলোতে যেমন সত্য খবর পাওয়া যায়, তেমনি তার মধ্যে আবার ভেজাল এসেও ঢোকে প্রচুর। আমার এক ইওরোপীয় বান্ধবীর এমনিতর একটি পোষা medium আছে। লোকটি third rate, যখন সে normal। কিন্তু tranceএর মধ্যে সব আশ্চর্য কথা বলে, 'Brothers'দের আবেশে। দেখেছি, বাজে কথাও বলে।

*

মৃত্যুর একটা মহান রূপ আছে। সে-রূপ আকাশের মত। 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' — এই মৃত্যুর রূপ। এইটি রবীন্দ্রনাথের ইষ্টমন্ত্রও ছিল।

মৃত্যুকে ছুঁয়ে দেখার কথা যা বলেছিলাম, তাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। অসীম আকর্ষণ করে সীমাকে, তার অতলান্তে তাকে ডুবিয়ে দিতে চায়। সীমা কেঁদে ওঠে — কিন্তু ভয়ে নয়। সে চ্যুতিক্ষণে অসীমের আশ্বাস চায়। অসীম তাকে বাহুবন্ধনে বাঁধে, কিন্তু ধর্ষণ করে না। সীমার সম্মতি চায় — এবং আশ্চর্য, পায়ও। এই পাওয়াটি জীবন-মৃত্যুর একটি অপরূপ গোধূলি-লগ্ন। তুমি মর না, অথচ মরলে কি হবে, তা বোঝবার পক্ষে এতটুকুও বাধা থাকে না। জীবন আর মরণের মাঝে একটা অতি হালকা আলোর আড়াল শুধু। রূপকের ভাষায় ছাড়া বলবার উপায় নাই।

*

কি মনে হচ্ছে জান কদিন ধরে ? মৃত্যুতে সব শেষ নয়, মৃত্যু দিয়েই জীবনের শুরু। বাইরে জানতে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে ফিরি, তখন মুখ ফিরাই ঘরের পানে। সেখানে জানার শেষ নাই, অথচ কী আশ্চর্য, শ্রান্তিও তো নাই। অনন্ত মরণ নিঃশব্দে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। তার মাঝে আলো ফুটছে, নিবছে — কখনও সূর্যের দীপ্তি, কখনও জ্যোৎস্নার স্নেহ, কখনও তারার উঁকিঝুঁকি। কখনও কিছুই নাই, আর সেই না-থাকাটাই সব অস্তিত্বের পূর্ণতা নিয়ে থমথম করছে।

*

বাস্তবিক, একটা সময় আসে, যখন সব-কিছুকে নিঃশেষ করে দিতে হয়। কঠোপনিষদের সেই শ্লোকটি স্মরণ কর — 'ন তত্র সূর্যো ভাতি' ইত্যাদি। অরূপই রূপের প্রবর্তক — এই বুদ্ধিতে 'তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি'। তখন অরূপে আর রূপে কোনও বিরোধ থাকে না। দেখি, অরূপেরই রূপ, রূপেরই অরূপ। যেন উজান-ভাটার খেলা।

*

অন্তর্যাত্রার পথ যেন আবার ভ্রূণশয়নে ফিরে যাওয়া । ফিরে যাওয়ার গভীর আনন্দ আছে, যদি অনুভব হতে দিই যে আমার অন্তর্যাত্রা মায়ের নাড়ীর টানে ।

তখন কর্তব্যবোধ থাকে না । কর্তব্য হল বহির্যাত্রার পথে । অন্তর্যাত্রার পথে কৃত ও কর্তব্য দুয়েরই নাশ হয় ।

তারপর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । ভ্রূণেরও জন্ম আছে । মৃত্যু সেখানে সমাহিত, অতএব বৈবস্বত ।

নচিকেতা এই মৃত্যুকে দর্শন এবং স্পর্শন করেছিলেন । তাঁর ভয় হয়নি ।

তুমিও কিশোর নচিকেতার মত অভয় হও, মৃত্যুর পাত্রে পরিবেশিত অমৃতকে আস্বাদন কর ।

*

জীবনে দুঃখ নাই, একথা যে বলবে, সে নির্বোধ । দুঃখভোগ থেকে কি করে বাঁচা যায় তার চেষ্টাই সবাই করছে । একটা হচ্ছে লৌকিক উপায় — যে-আয়তনে বা যে-পরিবেশে ভোগ হয়, তার পরিবর্তন সাধন-দ্বারা দুঃখ দূর করা । বিজ্ঞান এ-চেষ্টা করছে, এবং তা নিশ্চয় হেয় নয় ।

আরেকটা হচ্ছে অলৌকিক উপায় । যে দুঃখের ভোক্তা, তার রূপান্তর-সাধন দ্বারা দুঃখ এড়ানো । এই চেষ্টা করে অধ্যাত্মবিজ্ঞান ।

মৃত্যুযন্ত্রণা খুব বেশী হওয়া স্বাভাবিক নয় । যেমন প্রসব-যন্ত্রণাও বেশী হওয়া স্বাভাবিক নয় । স্বাভাবিক মৃত্যু হবে অনায়াস । অনেক অযোগীরও তা হয় । ঘুমিয়ে পড়ার মত মরে যাওয়া । যন্ত্রণা পেয়েই মরতে হবে, এটা সত্য নয় ।

অধ্যাত্মজীবন যাপন করলেও আমরা প্রায়শই সুস্থ জীবন যাপন করি না । কিছুটা নিজের দোষে, কিছুটা পারিপার্শ্বিকের দোষে, কিছুটা বংশানুক্রমের দোষে প্রাণকে আমরা বিকল করি । ফলে রোগ এবং মৃত্যুযন্ত্রণা দুটিই আমাদের মাঝে দেখা দেয়, অধ্যাত্মজগতে খুব উঁচুতে উঠলেও ।

কার দেহ কি রকম যন্ত্রণা ভোগ করবে, এটা আমরা এখনই স্থির করতে পারি না । আদি-মানবের দেহ স্বাভাবিকভাবেই সুস্থ থাকত । সুতরাং অনুমান করতে পারি, আদি-যুগের মহাপুরুষরাও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই মরতেন । ক্রমে দেহ আর মনে অসামঞ্জস্য দেখা দিল । তার ফলে রোগ-ভোগ আর মৃত্যুযন্ত্রণা । মানুষ মনের জোর বাড়িয়ে তার ঊর্দ্ধে উঠে যেতে চাইল এবং পারলও ।

রামকৃষ্ণ বলতেন, দেখছি, দেহটা যেন অখন্ড সচ্চিদানন্দের একটা খোল — গলার ঘা'টা তার এক পাশে পড়ে আছে ।

এটা সাধ্য, কিন্তু স্বাভাবিক নয় । তুমি normal থাকবার চেষ্টা যদি কর, বৈদিক ঋষিদের মত সব-কিছুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভূমার মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার, রোগ-ভোগ হবে কম, এবং সম্ভবত বেশ সুস্থ থেকেই মরতে পারবে । গাছের পাকা পাতা ঝরে পড়ার মত । অধিকাংশ মহাপুরুষেরই প্রাণিক জীবন সুস্থ নয় । সহজ স্বচ্ছ সরল অধ্যাত্মজীবনকে এখনও আমরা আদর্শগত করতে পারিনি । তাই রামকৃষ্ণের ভাষায় — 'দেহে থাকতে হলেই ট্যাক্স দিতে হবে ।' কিন্তু আমি বলি, কেন ? সুস্থ থাক, স্বচ্ছন্দে মর — এই তো চাই ।

*

জীবনের অবসান মরণে — একথার কাটান নাই। কিন্তু মৃত্যু তো শুধু অন্ধকার নয়, সে তো আলোও হতে পারে। কথাটা মনে হয় তোমায় আগেও বলেছি। যেমন নিদ্রা, তেমনি মৃত্যু। দুটাতেই চেতনার সংহরণ (ingathering)। আর তাই যোগ নয় কি ? যোগে চেতনা ক্ষিপ্ত নয়, চঞ্চল নয় — শান্ত একরস। মৃত্যুতেও যদি তাই হয় — তাই যদি হয় নিদ্রাতেও ? জাগ্রতে এবং জীবনে চেতনাকে যদি শান্ত ও একরস রাখতে পারি, অর্থাৎ ধ্যানচিত্তকে যদি সব সময় বহন করে চলতে পারি, তাহলে মৃত্যু আর ভয়ের থাকে না। অনুভব হয়, মৃত্যু শিবস্বরূপ, জীবন মৃত্যুতেই লগ্ন — যেমন শিবের বুকে লগ্ন সুষুপ্তা শক্তি।

এই অনুভবটা জীবনে সহজ হলে জীবন সত্যি উৎসব বলে অনুভব হয় — মৃত্যুর অমৃতবর্ণ-রসে রসায়িত উৎসব।

মা কে ? ভূমাই মা। তুমি ভূমাতেই আছ। তোমার ভয় কি ? ভয় মনের বিকার। উদ্দালক ছান্দোগ্যে বলেছিলেন, মনের চাইতে প্রাণ বড়। সত্যি তাই। প্রাণ স্বচ্ছ, নিরাময়, একরস। বড় সুন্দর এই প্রাণ। সেই প্রাণই ভূমা। তাই আনন্দ।

তুমি এই আনন্দেই আছ।

*

আমি যদি না থাকি, তাহলে মৃত্যু — তাকে গাল-ভরা যত নামই দিই না কেন।
মরবার সময় যদি দেখি, আরে, তুমিই তো আছ, তা হলেই অমৃত।
সেই তুমির বুকে এই জীবনেও আমির ছায়া দুলছে।
কী আনন্দ। যতক্ষণ দেখব, ততক্ষণ আনন্দ। যখন দেখব না, তখনও জানব আনন্দই।

*

'জী' আসলে ছিল 'ত্বং জীব' = জীয় = জী।

কী আনন্দ ! আমি বেঁচে আছি, সুতরাং তুমিও বাঁচ — জী ! আমরা সবাই আনন্দে বাঁচি — জী ! ওই হাতিটা বাঁচুক, কুতিয়াও বাঁচুক — জী ! কবির বাঁচুন, দেবব্রত বাঁচুক — জী !

সারা দুনিয়া জুড়ে এক অনাহত আনন্দের মন্ত্র মন্দ্রিত হচ্ছে — জী — জী — জী ! বাঁচ — বাঁচ — বাঁচ। কোথায় মৃত্যু, কোথায় ভয়, কোথায় দুঃখ, কোথায় দৈন্য — জী ?

দেবব্রতজী,

অনির্বাণ — জী।

ঠিকানা লিখতে গিয়ে দেখছি, রসা রোড — 49 জী।
রসে জী — আনন্দে জী !!

*

তোমার ... অনুভূতিগুলি খাসা । ভয় পেয়ো না — তোমার অনুভব নয়, তাঁরই অনুভব তোমার মধ্যে তিনি ঠেসে-ঠেসে দিচ্ছেন, এমনটা করবার সময় তিনি কি আর দূরে থাকেন ? নিজের হাতে ঠেসতে থাকেন । সুতরাং ভয় দেখান যেমন তিনিই, তেমনি তিনিই আবার বুকে চেপে ধরেন । সে-চাপে যদি মৃত্যু হয় ? হ'ক না — তখন ওই ব্রহ্মান্ডস্ফোট শুনবে আর ওই প্রচন্ড বিদ্যুতের বিদ্যোত দেখতে পাবে, তারপরেই সব ঠান্ডা । তখন কি আর কারও হুঁস থাকে, সে বাঁচল না মরল ? মরণ-বাঁচন যেখানে একাকার, সেখানেই তো বৈবস্বত-মৃত্যু । তার সামনে দাঁড়িয়ে ওই কিশোর নচিকেতা — তার জানবার আগ্রহের যেন আর শেষ নাই ।

*

'প্রেতে চিকিৎসা' থেকেই এসেছিল অসৎ ব্রহ্মবাদ — বুদ্ধ যাকে বলেছিলেন শূন্যবাদ । 'প্রেত' মানে কিন্তু মরে যাওয়া নয় — ছাপিয়ে যাওয়া । মরমীয়া যাকে বলতেন, জ্যান্তে মরা হওয়া । তাঁকে জানতে গিয়ে আর কূল পাই না । তখন অকূলে ভেসে পড়ি । এটাকে যাম্য বা বারুণী বিদ্যা বলতে পার — যদি কোনও নাম দিতে চাও । সব উপনিষদেই এর কথা আছে ।

বাঁচাটা বুঝলে মরাটাও বোঝা যায় । বাঁচা আর মরা তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে । তাই-তে ঋষি বললেন, 'যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ' — অমৃত আর মৃত্যু দুই-ই তাঁর ছায়া ।

*

মানসের নীল জলে নাকি রাজহংস সাঁতার কেটে বেড়ায় । মানস কখন নীল হয় ? যখন তা সব ছাপিয়ে অনন্তে দিশাহারা হয়, বাইরে থেকে মনে হয় সে বুঝি মৃত্যু । না, সে অমৃত । তার সব-কিছুই অমৃত ; কেননা তার হারাবার কিছুই নাই ।

*

তারপর শোন :

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তুষশ্চ ।।

— কী আশ্চর্য ! ওই যে উঠে এলো দেবতাদের পুঞ্জ জ্যোতি, যা মিত্রের, বরুণের আর অগ্নির চোখে (বরুণ অব্যক্ত মহাশূন্য, মিত্র ব্যক্ত-জ্যোতির আনন্ত্য, অগ্নি জীবচৈতন্য) — আপূরিত

করলেন দ্যুলোক পৃথিবী আর অন্তরিক্ষ, এই সূর্য — যা-কিছু চলছে বা স্থির হয়ে আছে তার আত্মা হয়ে ।

'যস্য মৃত্যুরমৃতং যস্য ছায়া' —
মৃত্যু আর অমৃত দুই-ই যাঁর ছায়া ।
তবে ভয় কোথায় ? তোমার আত্মবীর্য সবিতারই প্রচোদনা — 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' ।
সব আলো, সব শক্তি, সব আনন্দ ।

*

বৈবস্বত-মৃত্যু = আলোর মরণ । যেমন শুকতারা সূর্যকে দেখতে গিয়ে মরল অর্থাৎ অমৃত হল । যোগের ভাষায় সম্প্রজ্ঞাতের সার্থকতা ঘটল অসম্প্রজ্ঞাতের প্লাবনে বিলীন হয়ে । চোখ দিয়ে সূর্য দেখছি, সে দেখা পূর্ণ দেখা নয় । দেখতে গিয়ে চোখ যখন সূর্য হয়ে গেল, তখন একদিকে 'ডুবল নয়ন রসের তিমিরে', আরেক দিকে সেই দেখায় হল বেদের ভাষায় 'সূরচক্ষা'-র দর্শন । দার্শনিক বলবেন, সত্ত্ব দিয়ে আত্মাকে দেখা গৌণ ; মুখ্যদর্শন হল আত্মজ্যোতিতে সত্ত্বের দীপ্তি । ভক্ত বলেন, তখন সব তুহুঁ তুহুঁ । এই হল আলোর মরণ ।

*

বিবস্বান্ থেকে বৈবস্বত । বিবস্বানকে আমরা ভুলে গেছি । বেদে আছে — আদিজ্যোতির নাম বিবস্বান্ । তাঁর জাতক বৈবস্বত যম । সুতরাং যম মৃত্যুর অন্ধকার নন — তিনি অন্ধকার প্রাকৃত জনের কাছে । কিন্তু যোগীর কাছে তিনি 'আলো ঝলমল' (কথাটার অর্থই তাই), যেন Supernova, যেন Dying Sun এর explosion । নচিকেতা তাকে দেখেছিলেন । তুমিও দেখবে ।

আর এই যমই 'সত্যধর্ম' । সত্য আর ধর্ম । সত্য অনাদি পুরুষ, ধর্ম অনাদি প্রকৃতি । বেদে এই ধর্মকে বলা হয়েছে 'ঋত' । আরও বলা হয়েছে সৃষ্টির প্রজ্বলন্ত তপস্যা হতে আবির্ভূত হল এক আদি মিথুন — সত্য আর ঋত । দুই-ই all-inclusive । আর দুটিতে মিলে ''বৈবস্বত যম'' অর্থাৎ বিবস্বৎ সত্যম্ আর ঋতের মিথুনীভাব হতে উৎপন্ন যম । ''যম'' কিনা twin । কিসের, না আলো আর কালোর । তাঁকে না ভালবেসে পারা যায় ? রবীন্দ্রনাথ তাই হয়েছিলেন 'যম-পাগলা' ।

*

যম শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'twin' — যেমন 'যম-জ' শব্দে । যমের দুটা বৃত্তি আছে । তিনি একাধারে মৃত্যু এবং অমৃত । মৃত্যুরূপে তিনি সংসারের 'রাজা' কিনা প্রশাস্তা, আর অমৃতরূপে বৈবস্বত । অবিদ্বানের কাছে তিনি মৃত্যু — তখন তাঁর হাতে পাশ, আর বিদ্বানের

কাছে অমৃত — তিনি তখন অভয়জ্যোতি। তাঁর এই যুগল-বৃত্তির জন্য তিনি যম। আবার যম্ ধাতুর অর্থ সঙ্কোচ এবং প্রসার দুই-ই হয়। মৃত্যুরূপে যম সঙ্কোচ সাধন করেন জীবনের আর অমৃতরূপে তাকে বৈবস্বত-জ্যোতিতে প্রসারিত করেন। তখন তিনি 'নচিকেতা' মানবের গুরু। এই ভাবনাগুলো বেদে আছে।

সত্য পিতা-মাতা, ঋত তাঁর শক্তি। দুই-ই অমৃত। দুয়ের মধ্যে যম উজান-ভাটায় যথাক্রমে অমৃত এবং মৃত্যু। একবার তিনি নেমে আসছেন মায়ের গর্ভে মৃত্যুবশ হয়ে ; আবার তিনি উঠে যাচ্ছেন পিতার হৃদয়ে অমৃত হয়ে। শতপথব্রাহ্মণে তাই একটা অদ্ভুত কথা আছে 'যমোহ বৈ মনুষ্যানাং প্রথমো মমার' অর্থাৎ মানুষ হয়ে তিনিই প্রথমে দেখিয়ে দিলেন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতের পথ, পিতা ও মাতার মধ্যে উজান-ভাটায় তিনি তাই Trinity-ও বটে।

*

আমার অধিকাংশ কবিতারই মূল সুর ওই — মহাশূন্যকে যদি আশ্রয় না কর তাহলে পূর্ণকেও তুমি পাবে না। বুদ্ধ-শঙ্কর ওই মহাশূন্যের কথাই বলে গেছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে দিব্যজীবন প্রতিষ্ঠিত হবে, একথা কিন্তু সত্য নয়। শ্রীঅরবিন্দও একথা বলেন নি। যেখানেই তুমি দিব্যের কথা বলতে যাবে, সেখানেই অদিব্যের কথা উঠবেই — আলোর পাশে ছায়ার মত। তোমাকে চলে যেতে হবে দুয়ের ওপারে, মহাশূন্যে। তখনই দিব্য আর অদিব্যের বিরোধের সমন্বয় হবে। তখন দেখবে, অদিব্য দিব্যেরই বিভূতি।

... ওই মহাশূন্য আছে বলেই শক্তি তাঁর বুকে খেলা করছে। অদিব্যকে দিব্য করে তোলার একটা আধার পাচ্ছে।

Life যখন Divine হবে, তখন Death হবে luminous অর্থাৎ শূন্যের বুকে চলবে অফুরন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দের লীলা। তা-ই মা। শ্রীঅরবিন্দের luminous death-এর তাই তাৎপর্য।

*

বেদে দেবতা অজর অমর। জরা-মৃত্যু হল কাল-পরিণামের ফল। দেবতা কালাতীত, তাই তিনি অজর এবং অমৃত — স্বরূপতই। দক্ষিণামূর্তি ওই কালাতীত পুরুষ। বেদে তাঁকে ষোড়শকল সোম্যপুরুষ বলা হয়েছে। তখন তিনি চিরকিশোর আনন্দতত্ত্ব।

যিনি কালাতীত তিনি চিরযুবা বা চিরকিশোর। কালের পরিণাম ষড়্ভাব-বিকারের দিকে, বার্ধক্যের দিকে — যার শেষে মৃত্যু।

*

'ভব' মানে 'জন্ম'। ক্ষুদ্র বাসনা থেকে প্রাকৃত জন্ম আর জীবন। ওতে ওই রাগ-দ্বেষের দ্বন্দ্ব, আর তাইতে অবিদ্যা-অহন্তাজনিত ক্লেশ এবং তার ফলে মূঢ় অভিনিবেশ। এই ক্লিষ্টচেতনাই ভবরোগ। দক্ষিণামূর্তির ভাবনায় চিত্ত আকাশবৎ প্রসন্ন ও প্রজ্বল হয়। তখনই তুমি

সত্যধৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে দিব্যজীবনের অধিকার পেলে । দিব্যজীবন স্ব-স্থ জীবন — যেমন শ্রীকৃষ্ণের ।

*

জনন-মরণ শুধু প্রাকৃত জন্ম-মরণ নয়, যে-কোনও বৃত্তির উদয়-বিলয়ও তা-ই । আমি যদি দুয়ের সাক্ষী হই, তাহলে তারা চেতনার সমুদ্রে ঢেউএর মত ওঠা-নামা করে আর আমার সত্তা আনন্দে দুলতে থাকে । দক্ষিণামূর্তির এই সহজ অনুভব শিষ্যের মধ্যে সঞ্চার করার সামর্থ্যই তাঁর জনন-মরণচ্ছেদ-দক্ষতা ।

*

'গয়' একটি বৈদিক শব্দ, সংস্কৃত প্রতিরূপ হল 'জয়' — দুটিই এসেছে 'জি' ধাতু থেকে । ওই ধাতু থেকে 'জিন' শব্দও এসেছে । যিনি মৃত্যু জয় করেছেন, তিনি 'জিন' । শিব জিন । শিব আকাশবৎ । ওই আকাশে সংজ্ঞার সূর্য জ্বলছে, যার আলোতে সবার চৈতন্য । কিন্তু লৌকিক সূর্য অস্ত যায় — তখন সব অন্ধকার । মহাসূর্য উদয়াস্তহীন, সেখানে সদাই আলো — যেমন সুমেরুবিন্দুতে, তোমার সহস্রারে । এই আলো নীচের আলোগুলি প্রকাশিত করছে, সৃষ্টিকে প্রকাশ করছে — অনস্তমিত থেকে । এই আলোও জিন ।

কিন্তু আকাশ আর মহাসূর্য যদি একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ হয়, তাহলে তিনি যুগপৎ আলো এবং তার অতীত আঁধারও — যেখানে 'ন সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্' । সেখানে তাহলে কি আছে ? শুধু অস্তির বোধ, সেও আলো, কিন্তু সে-আলো সৃষ্টির আলোকেও প্রকাশিত করে বলে অনালোকবৎ ।

এইটি 'জিনে'র অবস্থা । তিনি আছেন গয়শীর্ষে কিনা সমস্ত জয়ের চূড়ায় । তিনি যেমন আলো হয়ে অন্ধকারকে জয় করেছেন, তেমনি আবার 'অস্তিত্ব' বা 'সন্মাত্র' হয়ে আলোকেও জয় করেছেন । তিনি যেমন মৃত্যুকে জয় করেছেন, তেমনি অমৃতের ভিখারী নন বলে অমৃতকেও জয় করেছেন । অতএব তাঁর জয়ই পরম জয় ।

*

শিব পৌরাণিক দেবতা । বেদে তাঁর আদিরূপ হল 'রুদ্র' । রুদ্র মৃত্যুর দেবতা, যমও তা-ই । তাইতে যিনি যম, তিনিই রুদ্র । ঋক্‌সংহিতায় যম আর বরুণ দুজনকেই বলা হয়েছে একই দেবতত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ । যমের দুটি রূপ পাই কঠোপনিষদে — একরূপে তিনি প্রাকৃত মৃত্যু, আরেকরূপে তিনি বৈবস্বত, লোকোত্তর স্তব্ধতার দেবতা । এই বৈবস্বত যমই লোকগুরু । মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মৃত্যু অতিক্রম না করলে অমৃতকে পাওয়া যায় না । মৃত্যু যেমন প্রাকৃত যমরূপে আমাদের মারেন, তেমনি আবার বৈবস্বত যমরূপে ফুলকে মেরে ফল ফলান, আমাদের ভূমার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন । তাইতে তিনি গুরু ।

আর শিব বা বরুণ হলেন আলো-অন্ধকারের অতীত আকাশতত্ত্ব । তা-ই ভূমা । ভূমা সাধ্যরূপে গুরু, আর যম সাধনরূপে গুরু ।

*

মৃত্যু মানেই তো বাইরের আলো নিবে যাওয়া । কিন্তু অন্তরের আলো তখনও অনির্বাণ থাকতে পারে । নচিকেতা সেই অন্তরের আলোকে দিশারী করে মৃত্যুর অন্ধকার সাঁতরে পার হচ্ছেন । তাঁর তিনটি শরীর — অন্নময়, প্রাণময় আর মনোময় । এক-একটি শরীর খসে পড়ছে, আর পিছনটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে । সামনে কিন্তু আছে হৃদয়ের প্রদ্যোত — তা-ই দিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন । অবশেষে মনের আলোও নিবে গেল — রইল শুধু বিজ্ঞান বা আত্মজ্যোতি । তিন রাত্রি পার হয়ে নচিকেতা মহামৃত্যুর মুখামুখি এসে দাঁড়ালেন ।

নচিকেতা পৃথিবীতে মূর্ছিত হয়ে অর্থাৎ জড়-সমাধিতে ডুবে গিয়েছিলেন । তাই তাঁর স্থূল শরীরটা এখানেই পড়ে ছিল । কিন্তু সূক্ষ্ম আতিবাহিক শরীর নিয়ে তখনও তাঁর উৎক্রমণ চলছে । শেষটায় পেলেন বিজ্ঞানময় শরীর — বেদে যাকে বলা হয়েছে হিরণ্যশরীর । তা-ই নিয়ে তিনি যমের সামনে দাঁড়ালেন । কিন্তু তিনি ওই হিরণ্যশরীর নিয়েই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইলেন — এলেনও । এইটি তাঁর যমের কাছে পাওয়া প্রথম বর । নচিকেতার মুখ্য সম্পদ ছিল ‘শ্রদ্ধা’ বা আস্তিক্যবুদ্ধি, পরমার্থ সম্পর্কে আভাস-জ্ঞান । ব্রহ্মচর্য আর পিতৃভক্তি তার গৌণ পরিণাম ।

*

মৃত্যুকে মহানিদ্রাও বলে । ঘুমে যেমন মনের লয় হয়, মৃত্যুতেও তেমনি মনের লয় হয় । কিন্তু ঘুমে প্রাণের লয় হয় না । মৃত্যুতে তা-ও হয় ।

সমাধিতে মনের লয় হয় । আবার এমন সমাধিও আছে, যাতে প্রাণেরও কোনও লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না ।

তাহলে ঘুম, মৃত্যু আর সমাধির ধরনটা একই রকম । কিন্তু সমাধির সঙ্গে ঘুম আর মৃত্যুর একটা মস্ত তফাত হল, সমাধিতে মন থাকে না, কিন্তু মনেরও গভীরে যে-বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা তা ফুটে ওঠে ।

সাধারণ মানুষের ঘুমে বা মৃত্যুতে মনের লয়ে কিন্তু প্রজ্ঞান ফুটে ওঠে না । যোগীর ঘুমে এবং মৃত্যুতে এই প্রজ্ঞান ফুটে ওঠে । তাইতে যোগীর নিদ্রা যোগনিদ্রা, যোগীর মৃত্যু বৈবস্বত-মৃত্যু । সে-মৃত্যু অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া নয় — একটা মহাজ্যোতিতে মিশে যাওয়া । একেই বলে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া । তাতে যোগীর দেহের মৃত্যু হয় প্রাকৃত মানুষেরই মত, কিন্তু ভিতরটা সীমাহীন অনির্বাণ একটা আলোয় জ্বলে ওঠে ।

এই আলো মরবার আগেও জ্বলে ওঠে । তারই জন্য সাধনা । জীবনে এই-আলো জ্বললে মরণেও তা জ্বলবে । তখন জীবন-মরণ একাকার হয়ে যাবে । প্রাকৃত মৃত্যুতে তখন আর ভয় থাকবে না । মনে হবে, মরে আমি আমার স্বরূপে, তাঁর মধ্যেই যাচ্ছি ।

ওই অনন্ত জ্যোতিই ঈশ্বর । তাঁকে পেলে আর দুঃখ বা ভয় থাকে না । দুঃখজয়ের জন্যই অমৃতজ্যোতির অভয়জ্যোতির সাধনা ।

আবার এই জ্যোতিই অন্তর্যামিরূপে তোমার গুরু । তাঁকে পাওয়া যায় মনকে অন্তর্মুখ করে, তাকে তলিয়ে দিয়ে, তার চাঞ্চল্য বন্ধ করে, তাকে প্রশান্ত করে । যখন মনোলয় হয়, অথচ 'আমি আছি' এই বোধ হয়, তখন চৈতন্য যেন আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে । ছড়িয়ে পড়ে তাঁরই ব্যাপ্তিচৈতন্যে । এমনি করে তাঁকে পাওয়া যায় ।

*

অস্তিত্বের দুই পিঠ — এক পিঠ জীবন, আর এক পিঠ মৃত্যু । দুই-ই সত্য । শুধু তাই নয় — দুটিতে ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে । জীবন-মৃত্যুর প্রাকৃত আর অপ্রাকৃত দুটি রূপ আছে । প্রাকৃত মৃত্যু যেমন প্রাণের বিয়োগ, তেমনি আবার প্রতিদিন নিদ্রায় মনের লয় । প্রাকৃত জীবন যেমন দৈনন্দিন জাগ্রতের জীবন, তেমনি আবার প্রতিদিনের স্বপ্নজীবনও । নিদ্রাকে ধরে জীবন আর মৃত্যুর রহস্য বোঝা যায় । নিদ্রায় মনোলয় হলে সুষুপ্তি, আর বাহ্যজগৎ অন্তরে গুটিয়ে এলে স্বপ্ন । তাহলে আমরা মোটের উপর চেতনার তিনটি ভূমি পাচ্ছি — জাগ্রৎ, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি । এর মধ্যে জাগ্রৎ-চেতনা জীবন, সুপ্তি-চেতনা মৃত্যু । স্বপ্ন দুয়ের মাঝামাঝি — বাইরে চেতনার লোপ হয়ে অন্তরে তার ফুটে ওঠা । প্রাকৃত জীবের মধ্যে এগুলি অবশে হয় — পর্যায়ক্রমে ।

অপ্রাকৃত নিদ্রা বা যোগনিদ্রা হল ধ্যানের ভিতর দিয়ে সমাধিতে উত্তীর্ণ হওয়া । ধ্যানে মন বাইরের জগৎ হতে গুটিয়ে এসে অন্তরে জেগে ওঠে — স্বপ্নের মত । অন্তরে ধ্যানের ছবিও থাকে না, নির্বিষয় শান্তিতে সব ডুবে যায় যখন, তখন সমাধি বা যোগনিদ্রা । এ-ও মৃত্যু । কিন্তু এই সুপ্তি বা মৃত্যুতে চেতনা হারায় না — আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । তখন অনন্তের বোধ হয় । দেখি জীবন-মৃত্যুর ওপারে এক নিঃসীম অস্তিত্ব, তার দুটি পক্ষ জীবন আর মরণ — দিন আর রাতের মত । তখন আমি প্রাকৃত-মরণে মরেও মরি না, অন্তরে জ্বলে উঠি, আর তারই আভা জীবন হয়ে ফুটে ওঠে — আমার একার জীবন নয়, বিশ্বের জীবন ।

*

ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তাঁর অস্তিত্বেই সবার অস্তিত্ব — তিনিই সব হয়েছেন । তিনি একরকম হয়েই যে আছেন, তা নয় — আলো-আঁধার, জীবন-মরণ, চৈতন্য-জড় ইত্যাদি বিচিত্র দ্বৈত-লীলায় তাঁর স্থিতি । কিন্তু এই স্থিতি একেবারে স্তব্ধ নয় । স্থিতির যেন দুটি বিন্দু আছে — যেমন পৃথিবীর একটা গোলক, তার North Pole সূর্যের দিকে সব সময় উঁচিয়ে রয়েছে, তাকে বলে সুমেরু । সেখানে সবসময় আলো — কিন্তু সব আলো যেন সেখানে নিস্পন্দ । আবার বিপরীত প্রান্তে South Pole — যেখানে চিরশৈত্য, চিরমরণ, চির-অন্ধকার । এটাকে বলতে পার জড় । এও ওই আলোর মত নিস্পন্দ ।

কিন্তু দুয়ের মধ্যে চলছে শক্তির খেলা । নিষ্প্রাণ জড় স্পন্দিত হচ্ছে প্রাণে — স্পন্দিত হতে হতে চিন্ময় হয়ে উঠছে, তারপর মহাচৈতন্যে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে ।

আসল ছবিটি এই ধরনের । সুমেরু আর কুমেরু দুই-ই স্তব্ধ — একটি চৈতন্যের স্তব্ধতা বা মহাসমাধি, আরেকটি জড়ের স্তব্ধতা বা মহামৃত্যু । দুয়ের মধ্যে প্রাণের দোলা ।

এইভাবে বললে সুমেরু-কুমেরুর উপমাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

*

প্রথমপুরুষকে বেদে বলা হয় ‘হিরণ্যগর্ভ’ — তিনি যেন হিরণ্য-জ্যোতির্ময় একটি ভ্রূণ । আত্মা — আকার-প্রকারহীন । তিনি যখন 'ব্যাকৃত' হন অর্থাৎ বিশিষ্ট আকার ধরেন, তখন তিনি পুরুষ । আত্মা শুদ্ধচৈতন্য, আর সেই শুদ্ধচৈতন্য মন-প্রাণ-দেহে অভিব্যক্ত হয়ে পুরুষ হন । তখন সৃষ্টি । সৃষ্টি থাকলে প্রলয়ও আছে । জন্ম থাকলে মরণও আছে । জন্ম যেন বাইরে ফুটে বেরনো । আর মৃত্যু ভিতরে গুটিয়ে আসা । আমাদের মধ্যে এটি পর্যায়ক্রমে ঘটে বলে আমরা দুয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করি । কিন্তু পুরুষে দুটি ওতপ্রোত । আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আর যতদিন বেঁচে থাকি, ততদিন কেবল, খাই-খাই করি । তাকে বলে ‘অশনায়া-পিপাসা’ কিনা ক্ষুধা-তৃষ্ণা । অশনায়া মানে খাওয়ার ইচ্ছা । ‘অনশন’ না খাওয়া, অশন খাওয়া — জান তো ?

খেয়ে বাঁচতে হলে একদিন মরতেই হবে । বাইরের কিছুর উপর নির্ভর করলেই মরণ — কেননা বাইরের কোনও-কিছুই চিরস্থায়ী নয় । যা চিরস্থায়ী নয়, আমাদের সাধারণ চেতনায় মনে হয় সে চলে গেল, ফুরিয়ে গেল, মরে গেল । কিন্তু কিছুই যায় না — সব থাকে । থাকে ওই পুরুষের মধ্যে । আমরা মরতে চাই না, অমৃত হয়ে বাঁচতে চাই । কিন্তু তবু আমাদের মরতে হয় বারবার । মরি, আবার বেঁচে উঠি — সূর্যের উদয়াস্তের মত । বেঁচে থাকি যখন, তখন মরি না বলে বলি ওটা ‘অমৃত’ । কিন্তু তা তো শাশ্বত অমৃত নয় । অমনি করে মরা আর না-মরা দুই-ই ওই পরমপুরুষের মধ্যে যেন দুলছে । তিনি তার ঊর্ধ্বে । তাই আমাদের মৃত্যু বা অমৃত দুই-ই তাঁর ছায়া । সত্যকার অমৃত হচ্ছে এই প্রাকৃত জীবন-মরণের দোলার ঊর্ধ্বে চলে যাওয়া । তখন আত্মবোধ জাগে । আত্মাই শাশ্বত অমৃত । সেই শাশ্বত অমৃতের দুটি দোলা জীবনে আর মরণে, তাই প্রথমপুরুষের মধ্যে । তিনি স্বরূপত দুয়ের ঊর্ধ্বে ।

প্রাকৃত মৃত্যু একটা আবর্তন । তার পরিণাম অমৃত নয় — আবার বেঁচে ওঠা, আবার মরা — এমনি করে বারবার । তার ঊর্ধ্বে চেতনার শাশ্বত অমৃতত্বের ভূমি । জীবন-মৃত্যু প্রাকৃত জীবের ; অমৃত শাশ্বত পুরুষের । তিনিই জীবন-মরণের দোলায় দুলছেন । তাঁর অনুভবে সবই সত্য । সেখানে জীবনও অমৃত, মরণও অমৃত — কেননা সবই তিনি । এই অনুভব আমরাও পেতে পারি ।

*

দিব্যজীবন মানে প্রাকৃত জীবন-মরণের ঊর্ধ্বে অনন্ত জীবন — যার মধ্যে জীবন-মরণের ভাগাভাগি নাই । তাকে যদি আকাশ বল, তবে সে জীবন, যদি আনন্দ বল, তবে সে জীবন । আসল কথা হচ্ছে একটা অখন্ড অনুভবেরই একটা পিঠ জীবন, আরেকটা পিঠ মরণ । দিব্যজীবন আর দিব্যমরণ একই কথা — যেন শিবের কোলে গৌরী, আকাশের বুকে আলো । একটা মরণ, আরেকটা জীবন । দুয়ে ভেদ কোথায় ?

*

পিতৃবিয়োগে নিশ্চয় শোককাতর হওনি । বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে যায়, তুমিও একদিন মিশে যাবে, আরও উজ্জ্বল হয়ে মিশবে — পিতা এই দায়ই রেখে যান পুত্রের উপর । সেই পিতৃদায় পালন করো সারা জীবন ।

*

পিতাকে আত্মারূপে ভাবনা করা ভাল । তোমার বাসনা আছে কিনা, তার পরীক্ষা হচ্ছে — এই আঘাতের পর । তোমার পিতা দীর্ঘজীবী ছিলেন, কিন্তু অমর তো ছিলেন না । সুতরাং তার অপরিহার্য মৃত্যুর জন্য এখন আর শোক করো না — অতীত নিয়ে অনুশোচনাও করো না । কেউ কারো মৃত্যুর কারণ হয় না — জীবন-মৃত্যু যাঁর হাতে, তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন কর । Mother কে কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

মৃতকে যেতে দাও, তাকে ফিরিয়ে আনবার কল্পনা করো না । সে-কল্পনা নিষ্ফল তো হবেই, তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাধাই সৃষ্টি করবে । তোমার পিতা সমুদ্রে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেছেন । আমিও যাব, তুমিও যাবে । কিন্তু সমুদ্র থাকবেই । সেই সমুদ্রের ভাবনায় বৃহৎ হও ।

*

এ-জন্মটা যে-কর্মের বেগে চলেছে, তাকে বলে প্রারব্ধ । যোগে বা জ্ঞানে প্রারব্ধ নষ্ট হয়ে যায় । দুটাই হল অন্তর্মুখীনতা — যা কর্ম-প্রবৃত্তির বিপরীত । বহির্মুখীনতায় কর্ম বাড়ে, অন্তর্মুখীনতায় ক্ষয় হয় ।

সবই যখন সচ্চিদানন্দ, তখন মরলে পর সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কোথায় যাবে ? কিন্তু সবাই তা বুঝতে পারে না । যে-পর্যন্ত না বোঝে, সে-পর্যন্ত আসা-যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সবার বেলায় নয় । যার আত্মবোধ কিছুটা বিকশিত হয়েছে, সেই আসে যায় । আর সবাই তাঁর মধ্যে তলিয়ে যায় । এক হিসাবে সবারই এক গতি হয় — কেননা তিনি ছাড়া তো আর গতি নাই । আবার অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে এখানে সংসারে যেমন গতির তারতম্য হয়, মরলে পরেও তা-ই হবে । মৃত্যুর পর আত্মার তিনটা অবস্থা হতে পারে — যেমন ঘুমালে পর হয় । কেউ অজ্ঞানে ডুবে

যায়, কেউ স্বপ্ন দেখে, আবার কেউ যোগনিদ্রায় জেগে থাকে । শ্রাদ্ধ-শান্তির দ্বারা ওই অজ্ঞানের ভাব কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় এখানকার জ্ঞান দিয়ে ।

*

আমি আনন্দেই আছি । জীবনের সমস্ত দুর্বিপাকের অবসান ঘটেই, এবং ঘটে যখন বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে যায় । প্রতি মুহূর্তে এই অনুভবে জাগ্রত থাকতে পারলে তবেই জীবনের সার্থকতা ।

*

এই স্থূল দেহটাই সব নয় । এ তো ঝরে পড়বেই । কিন্তু এই দেহে যিনি সন্নিবিষ্ট, তিনি অক্ষয়-অব্যয় ; তাঁর আবেশের বীর্য অনির্বাণ ।

*

নাম-রূপ ছেড়ে সচ্চিদানন্দে উত্তীর্ণ হওয়াই জীবের লক্ষ্য । বুদ্বুদ যেমন সমুদ্রে মিশে গেলে তার পৃথক অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি । সুতরাং মৃত্যুর পর তুমি আর দেহধারী থাকবে না । তোমার বা আমার পৃথক অস্তিত্ব থাকবে না । তাহলে দেখা হবে কি করে ? এমনতর প্রার্থনা অবিদ্যার লক্ষণ । অবিদ্যার সংস্কার ছাড়িয়ে ওঠ ।

ভবিষ্যতের খবর আমি রাখি না, কৌতূহলও নাই । জানি, তাঁকে লাভ করাই আমাদের একমাত্র সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ । সুতরাং তোমার বা আমার কি হবে, তা আমার জানা নাই । তা নিয়ে আমি মাথাও ঘামাই না । নদী যেমন চলার সময় সমুদ্রের টান অনুভব করে, তেমনি অহরহ সচ্চিদানন্দের আকর্ষণ অনুভব করাই আমাদের পরিণাম-সম্বন্ধে নৈশ্চিত্যের বোধ এনে দেয় । যেমন করেই হ'ক সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে আমরা পড়বই — এই আমাদের আশ্বাস এবং আশা ।

*

আমার অবস্থা একই রকম । চিন্তা করো না । দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার মত তাঁর মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া, যিনি আলো আর কালো একাধারে । ভাবতে বেশ ভালো লাগে ।

*

... মৃত্যুরহস্য কঠোপনিষদ ছাড়া আর কোথাও এত প্রাঞ্জলভাবে কেউ আজ পর্যন্ত বলেনি । নিদ্রা, মৃত্যু, সমাধি, প্রলয় — তিনের মূলেই এক তত্ত্ব । এগুলি প্রথমে উপনিষদ পড়ে জেনেছিলাম যৌবন-কালে । তারপর দীর্ঘদিনের সাধনায় বেদমাতার প্রসাদে এগুলির সাক্ষাৎ উপলব্ধি

আমার হয়েছে । আমি যা অনুভব করি, তা-ই বলি । যা অনুভব হয়নি, তার কথা কখনও কাউকে বলিনা ।

*

মনের অতলে অনেক-কিছু লুকিয়ে থাকে, আমাদের এই বহির্মুখী সীমিত চেতনা দিয়ে যাদের সন্ধান আমরা পাই না, তারা আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝে-মাঝে হানা দিয়ে বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে ফেলে । এই রকম একটা অপশক্তি তোমার মধ্যে তর্কের ও যুক্তির পথে ভগবানকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ে তোমাকে বানচাল করতে চেয়েছিল — যুগধর্মের প্রভাবে । ... ভালবেসে তাঁকে হৃদয়ে পাও, বুদ্ধিতে পাবে তার পরে — আপনা হতেই । তখন তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন — যেমন রামকৃষ্ণকে, আনন্দময়ীকে বুঝিয়েছেন । মৃত্যুর পর কি হয়, তা একমাত্র ধ্যানেই জানা যায় — যখন বিলোমক্রমে আমাদের জগৎ (মনোভূমি), স্বপ্নে (বিজ্ঞানভূমি) এবং স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে (আনন্দভূমি) প্রবেশ করে, তখন বিশ্বরহস্যের মধ্যে আমরা প্রবেশ করি । সে-ও একটা অনন্তের রাজ্য । তার সবটুকু আমরা ধরতে পারি না, ধরবার প্রয়োজনও হয় না । নুনের পুতুলের মত আমরা তখন সমুদ্রে মিশে যাই । যদি বিশেষ-কিছু আমার জানা প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হয়, তিনি ভিতরে বিদ্যুতের দীপ জ্বালিয়ে তা জানিয়ে দেন ।

কতদিনে তাঁকে পাবে, এ-প্রশ্ন করলে আবার বিষ্ণুমায়ার কবলে পড়বে । শুধু এই বিশ্বাস স্থির রেখো, ''তুমি দেখা দাও বা না দাও, আমি তোমায় ছাড়ব না ।'' যোগনিদ্রা যখন তোমার পক্ষে সহজ হবে, তখন জন্মান্তরের বোধ আপনা থেকে জাগবে । তার আগে তা নিয়ে খোঁচাখুচি করলে বিপদ আছে । অধৈর্য হয়ো না, কিন্তু একাগ্র থেকো, তবেই সিদ্ধি ।

*

আমার জন্য ভেবো না । এ শরীর তো যাবেই । কিন্তু ভিতরের আগুন যেন না নিবে যায় — সেই চেষ্টাই আমাদের করে যেতে হবে সারা জীবন । তবেই আমরা আলোয়-আলোয় তাঁর কাছে চলে যেতে পারব — এই জীবনের আলোকবিন্দু সেই মহাজ্যোতির সঙ্গে মিশে যাবে ।

*

আত্মাকে জানা অথবা ভগবানকে জানা, দুটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য । আর দুয়েরই সাধনধারা এক — তা হচ্ছে অন্তরে ডোবা । বাইরের ব্যাপার নিয়ে জড়িয়ে থাকা তার বিরোধী । অথচ বাইরের সঙ্গে কারবার রাখতেই হয় । মনের চার-আনা দিয়ে সংসারের কাজ করে বাকি বারো-আনা দিয়ে ভগবানকে ডাক । জাগরণে তাঁর কাজ কর, নিদ্রায় তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যাও । এইভাবে দীর্ঘকালের অতন্দ্র সাধনার ফলে তাঁকে পাওয়া যায় । আর তাঁকে পেলে তিনিই বুঝিয়ে দেন জীবন-মৃত্যু কি, পরলোকের রহস্য কি, অলৌকিক অনুভবের স্বরূপ কি ।

মানুষের মৃত্যুর পর চার রকম অবস্থা হতে পারে, জীবনে চেতনার বিকাশ-অনুসারে ।

(১) অধিকাংশ মানুষই আবার অব্যক্তে লীন হয়ে যায় — ঘুমিয়ে পড়লে যেমন হয়, তেমনি ।

(২) কিছু-সংখ্যক মানুষ একটা আচ্ছন্ন-অবস্থায় থেকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে ।

(৩) আরও কম-সংখ্যক মানুষ মৃত্যুর পর আলোর রাজ্যে জেগে উঠে আলোর পথ ধরে চলে যায় ।

(৪) আরও কম-সংখ্যক মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আকাশের মত ছড়িয়ে পড়েন । তাঁদের বেলায় জীবন-মরণ কোনও ভেদ নাই ।

এটাকে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে থাকা বলতে পার । (২) এবং (৩)-কে বলতে পার individuality বজায় রাখা ।

*

সাযুজ্য-মুক্তি হল ভিতরে-ভিতরে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হওয়া, বাইরের জগৎ ছেড়ে । আর সাধর্ম্য-মুক্তি হল ভিতরে-বাইরে তাঁর সঙ্গে এক হওয়া । আকাশ আছে, সূর্য আছে ; আবার পৃথিবীও আছে । তুমি পৃথিবীকে ছেড়ে আকাশ বা সূর্য হতে পার, আবার তিনটিই যুগপৎ হতে পার । তেমনি হওয়াতেই জীবন দিব্য হয় ।

তখন তুমি বেঁচে থেকেও যেমন দিব্য, মরে গিয়েও তেমনি দিব্য । বেঁচে আছ, মানে পৃথিবীতে আছ, কিন্তু তখনও তুমি আকাশে সূর্য হয়ে জ্বলছ । মরে গেছ মানে তুমি আকাশ বা সূর্য হয়ে আছ, তখনও তুমি পৃথিবীকে বেষ্টন করে তাতে ফুল ফুটিয়ে চলছ । এমনি করে পূর্ণ ব্রহ্মকে পাওয়া বা হওয়াই হল সাধর্ম্য-মুক্তি বা অতিমানস-রূপান্তর বা দিব্যজীবন । এ অবস্থায় মরা-বাঁচার কথা ওঠে না ।

এখনও তো মানুষ বাঁচছে, মরছে । কিন্তু কোথায় ? না, ব্রহ্মে । কিন্তু তা বলে ব্রহ্মে তো বাঁচা-মরা কিছুই নাই, আবার আছেও । কিন্তু থাকলেও তাতে ব্রহ্মের স্বরূপহানি হচ্ছে না।

*

ভাগবত স্বামী ঠিকই বলেছেন । জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না । প্রলয়ে যে লীন হয়, সে অজ্ঞান নিয়েই লীন হয় । সুতরাং আবার সেই অজ্ঞান নিয়েই সৃষ্টিতে ভেসে ওঠে । তার মুক্তির কথাই ওঠে না । প্রতিদিন তুমি ঘুমাতে যাও, ঘুম সমাধির মত । কিন্তু অজ্ঞান নিয়ে ঘুমাতে যাও বলে ঘুম থেকে জ্ঞান নিয়ে জাগ না ; যা ছিলে, তাই হয়েই জাগ । অথচ তখন তুমি সমাধিতেই ছিলে ।

*

আমার শরীর একই রকম আছে । এ-শরীর জন্মেছে, সুতরাং এর ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু শরীরের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে যে-শরীরী আছেন, তিনি অবিনাশী, তাঁর জন্ম বা মৃত্যু নাই । তিনি

তোমার মধ্যেও আছেন । আমাকে যেমন করে তিনি ফুটিয়ে চলেছেন, তেমনি করে তোমায়ও ফোটাচ্ছেন । সুতরাং আমি বা তুমি আমরা কেউ বিচ্ছিন্ন নই, আমরা সবাই তাঁর কায়ব্যূহ — জীবদেহের কোষের মত আমরা তাঁরই দিব্যদেহের কোষ — এই বুদ্ধিতে তোমরা উজ্জ্বল থেকো । তাঁর দয়া হতে তোমরা বঞ্চিত হবে না । তিনি তোমাদের চান বলেই তুমি তাঁকে চাইতে পারছো — এই কথাটি মনে রেখো ।

*

শ্রাদ্ধকে বেদে বলা হয় পিতৃমেধ । ওটা একটা যজ্ঞ — পিতৃপুরুষের উদ্দেশে করা হয় । পিতৃপুরুষের আরেক নাম 'প্রেত' কি না যিনি এখান থেকে আলোর পথে উজিয়ে চলেছেন মৃত্যুর পর । তিনি তখন শিবস্বরূপ । এইজন্য তন্ত্রে শিবকেও বলে 'মহাপ্রেত' । তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করা — যজ্ঞশিষ্ট অমৃতরূপে, নিশ্চয় দোষের নয় । কিন্তু মানুষ 'প্রেত' বলতে বোঝে ভূত । তাই শ্রাদ্ধান্ন খেতে চায় না, তাতে প্রেতের দৃষ্টি পড়ে বলে । এটা কুসংস্কার । অনেক মহাপুরুষও — শ্রাদ্ধান্ন খেলে সব সাধনফল নষ্ট হয়ে যাবে, এমন ভয় দেখান । তাহলে তো কোনও মহাপুরুষের জন্মোৎসবেও প্রসাদ নেওয়া চলে না ।

*

দুরাত্মার মধ্যেও পরমাত্মা প্রচ্ছন্ন আছেন । শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁর উদ্দেশ্যেই শ্রাদ্ধে অন্নাদি নিবেদন করা হয়, যাতে দুরাত্মারও ঊর্ধ্বগতি হয় । এই শ্রদ্ধায় অর্পিত অন্ন শিব গ্রহণ করবেন না, তো কে করবে ? সবার মধ্যে তিনিই তো একমাত্র অন্নাদ বা অন্নভোক্তা । শ্রাদ্ধের বিধি ভূতের উপাসনা নয় — অজ্ঞানীরাই তা করে, হিন্দুর শ্রাদ্ধ দিব্য-পিতৃপুরুষের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয় — শ্রাদ্ধের মন্ত্রগুলি পড়ে দেখো ।

*

মহাপুরুষরা এই ঈশ্বরকর্মের শরিক হয়ে, আধিকারিক-পুরুষ বা অবতার-পুরুষ হয়ে, কখনও-বা পার্ষদ হয়ে নেমে আসেন । তখন তাঁরা দুঃখকে আনন্দে, মৃত্যুকে অমৃতে রূপান্তরিত করেন । তুমিও তা-ই কর ।

*

... বিরাটের কথা ঋগ্বেদে আছে, সামবেদে বৈরাজ-সামের কথা আছে, যজুর্বেদে পুরুষ-যজ্ঞে বিরাটের উদ্দেশে সবাইকে উৎসর্গ করার কথা আছে । 'বিরাট' শব্দের অর্থ, যিনি এক থেকেও এই বিচিত্র ভূতজগৎ হয়েছেন । আমরা ব্যষ্টি (individual soul), কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে

বহুর মাঝে ছড়িয়ে পড়বার একটা আকৃতি আছে। মৃত্যুর সময় এই বিরাট জগৎ হতে অন্তর্যামীর এক আত্মাতে গুটিয়ে আসবার একটা প্রবণতা দেখা দেয় — যোগীদের মত। তখন চেতনা সংহত হয়ে আবার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বময় সর্বভূতে ছড়িয়ে পড়ে। এমনি করে যুগপৎ কেন্দ্রে সংহনন আবার পরিধিতে বিস্ফারণ — এই ধরনের একটা double movement চলে। অর্থাৎ মৃত্যুতে আমরা নিজের মধ্যে গুটিয়ে এসে আবার সঙ্গে-সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ি। মুমূর্ষুতে এই ভাবটি জাগিয়ে তোলবার জন্যই তার কানে তারক-ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করা হয়। হিন্দুর সমগ্র শ্রাদ্ধকৃত্যটি এই বিরাট ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত।

*

তীর্থ ভগবানের লীলাভূমি — মহাপুরুষদের সাধনপীঠ — এই বুদ্ধিতে তীর্থ ভ্রমণ করতে হয়।

গয়ার বিষ্ণুপদ-সম্বন্ধে পান্ডারা কতকগুলি আজগুবি কথা বলেছে। গয় একটি বৈদিক শব্দ — সংস্কৃতে বলে 'জয়'। গয়াসুর অর্থ মৃত্যুঞ্জয় — যিনি আত্মবীর্যে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে নচিকেতার মত মৃত্যুরহস্য মৃত্যুর কাছ থেকেই আদায় করে অমৃত হয়েছিলেন। এটি অতি প্রাচীন একটি বৈদিক-সাধনার ধারা। ঘুমের মধ্যে ডুবে গিয়েও জেগে থাকা — যাকে বলে ''যোগনিদ্রা'' — তার সাধনা এর উপায়। বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতির সাধন-পন্থা এর আশ্রিত। বৈদিক ঋষিরা আদিত্যের উপাসক, তাঁরা আদিত্যের গতিকে অনুসরণ করে একটা ক্রমবর্ধমান আলোর দ্বারা জীবনকে মন্ডিত করতে চাইতেন। কিন্তু সূর্যও দিনের শেষে অস্ত যান — আমাদের যৌবনের পর জরা আসে, মৃত্যু আসে। অন্তর্মুখ দৃষ্টি দিয়ে যিনি এই অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করে তারও গভীরে উদয়াস্তহীন শাশ্বত সত্য জ্যোতিকে আবিষ্কার করেন, তিনিই গয়াসুর। বেদে 'অসুর' শব্দটি বরুণের বিশেষণ — বরুণ রাত্রির অন্ধকার, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এই জন্য কৃষ্ণ কালো, কিন্তু তাঁর বুকে কৌস্তুভের আলো, তা হলো সূর্য। বরুণই যথার্থ বিষ্ণুপদ। পিতৃপুরুষেরা যাতে মৃত্যুকে ভেদ করে অমৃতে উত্তীর্ণ হন তার জন্য গয়ায় শ্রাদ্ধ করার ব্যবস্থা।

*

নির্বাণমুক্তি সবারই চরম লক্ষ্য। জীবমাত্রেই নির্বাণমুক্তি লাভ করে না। অধিকাংশ জীবই কেবল জন্মায় অজ্ঞানে, মরেও অজ্ঞানে। এদের মধ্যে কেউ-কেউ আত্মচৈতন্যের উন্মেষে মানুষ হয়। মানুষদের মধ্যে বেশির ভাগই সংসারচক্রে আবর্তিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ উৎক্রান্তির পথ ধরবার অধিকার পায়। তারাই নির্বাণমুক্তি লাভ করতে পারে। তাদের মধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় কেউ-কেউ আধিকারিক পুরুষ হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা ঈশ্বরকোটির মানুষ।

*

সবিতা শুধু উদীয়মান সূর্য নন — তিনি অস্তসূর্যেরও দেবতা (ঋগ্বেদে) । যে-জ্যোতিকে পুবদিক থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি, তিনিই আবার অস্তময়নের পর পুবদিকে উঠে আসেন — জাগরণ নিদ্রা ও জীবন-মরণের প্রচোদয়িতা চিৎশক্তিরূপে । কেউ-কেউ উদয়াস্ত দিয়ে তাঁকে মানেন, আবার দুঃসাহসী সাধক অস্তের পরেও মৃত্যুর মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে অমৃতত্বকে পূর্ণাঙ্গ করতে চান । এইজন্য সবিতাকে অখন্ড চিজ্জ্যোতিরূপেই গ্রহণ করতে হবে, শুধু উষার কোমল আলোরূপে দেখলে চলবে না । তাইতে তিনি যেমন ভোরে বরেণ্য, তেমনি, মাধ্যন্দিন সূর্যরূপে জ্বালাময় — সাবিত্র-মন্ত্রে তাঁর দুটি রূপই ধরা আছে ।

*

হৈমবতীর হৃদয়ে সঞ্চরণ তোমার সার্থক হ'ক । এই পরিব্রজ্যার স্মৃতি তুষারশুভ্র হয়ে থাকুক তোমার ধর্মে, কর্মে, এবং মর্মে । আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল ওই হৈমবতী, মরণের সান্ত্বনাও ওই হৈমবতী । ভারতবর্ষের শক্তির উৎস আমি জানি ওইখানে ।

*

...অধ্যাত্মপ্রগতির একটা নিশানা হচ্ছে, ভাটার স্রোত কাটিয়ে যেতে পারা — বেশ সজাগ থেকে । দূর হতে সমুদ্রের কল্লোল শুনতে পাচ্ছ — জান, সেই সমুদ্রেই মিশে যাবে । এপারের কোন-কিছুর জন্যই যেন কোন আঁকুপাঁকু না থাকে । গীতার ভাষায় একেই বলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া । যেমন দিনের শেষে ঘুমিয়ে পড়ি, জীবনের শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ি, তেমনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করাই হল বাহাদুরি । ওই মৃত্যুর ভূমিকায় নিকষে সোনার লিখনের মত জীবনের কত বিচিত্র রংই না ফোটে । কিন্তু এই বর্ণলীলা দেখবার জন্য তোমার আগ্রহ চাই । তুমি শুধু অনুভব করছ, তোমার গভীরে এক অতল প্রশান্তি, আর তুমি তার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছ । তারপর কি তা আর বলা যায় না ।

এই প্রশান্তি তোমায় সমাহিত করুক ।

*

বিরহের ব্যাকুলতা যদি সব সময় জেগে থাকে, তা হ'লে জানবে মিলনের লগ্ন আসন্ন । হঠাৎ পরদা সরে যাবে, আর সব আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে । সংসারের কুশ্রীতাও তখন সে-আলোর পরাগ মেখে সুরমা হ'য়ে দেখা দেবে ।

*

জগতে একমাত্র নিত্য হচ্ছে বাইরে আকাশ, আর অন্তরে ভূমার বোধ — যা ওই আকাশেরই প্রতিবিম্ব । আকাশে চিৎসূর্য ওঠে । কিন্তু না উঠলেও আকাশ আকাশই । এই আকাশে তোমার

পরিব্যাপ্ত সত্তা — নিশ্চল নির্বিকার আনন্দময় এই সত্তায় থাকবার চেষ্টা করো। ''চেষ্টা'' বলা ঠিক হল না, আকাশকে নামতে দাও তোমার মধ্যে, তাকে বাধা দিও না। সত্তার সমস্ত দুয়ার খুলে দাও। মৃত্যুর অমৃত দিয়ে জীবনকে স্বাদু কর।

*

জীবনে যখন ভাটার টান ধরে — আর ৪০ পার হলেই ভাটা — তখন আর অর্জনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বর্জনের দিকে দৃষ্টি দেওয়াই ভালো। এখন স্রোতে ভেসে চল। ভেতরটা তাতে শান্ত হয়ে আসবে, আর তখন নেপথ্যে তোমার জীবনে যে সমারোহের আয়োজন হচ্ছে — সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার মত, তার আভাস পাবে। তখন বুঝবে, কিছু করা বা পাওয়ার চাইতে হওয়াটাই বড়। আর সে-হওয়া শেষ পর্যন্ত আকাশ হওয়া। নিবর্ণ।

*

শিলংএ এই আমার শেষ উৎসব হয়তো। আরও ছোট তিনটি অনুষ্ঠান আছে — বিজয়া, লক্ষ্মীপূর্ণিমা, আর কালীপূজা। জয়ন্তী উৎসব এই শেষ। এখানকার এই শান্ত সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে — কিন্তু আমার মনে ঢেউ উঠছে না। একদিন সবই তো ছেড়ে যেতে হবে। ''অপরূপকে দেখে গেলাম দুটি নয়ন মেলে'' — অথবা এই চোখ দিয়ে তিনিই তাঁকে দেখলেন, দেখছেন — সে দেখা তো ফুরাবার নয়।

*

তোমার বোনের জন্য দুঃখ করো না। অসীম সমুদ্রকে দেখ। কত বুদ্বুদ উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র কিন্তু যেমন, তেমনি আছে। কোনও বুদ্বুদ যদি জানতে পারে আমি সমুদ্রের, সে ধন্য।

*

কিন্তু মৃত্যুই তো জীবনের শেষ কথা নয়। কিংবা বাইরে পাওয়াতেই পাওয়ার একমাত্র সার্থকতা নয়। প্রিয়জনকে আমরা চাই অন্তরে। আর সে পাওয়াই আসল পাওয়া আর একমাত্র পাওয়া। অন্তরে যাকে পাই, তাকে কখনও হারাই না — হারাতে পারি না। বাইরে যিনি চলে যান, স্মৃতিতে তিনি আমার হয়ে থাকতে পারেন — যদি আমরা ইচ্ছা করি। তখন তিনি আর মর্ত্য মানব নন, তিনি অমৃতের সন্তান। আমরাও তাই।

এই জন্যই এদেশে প্রিয়জনের মধ্যে বারবার দেবতাকে দেখার কথা বলা হয়েছে। ভালবাসা মর্ত্যমানবকে অমৃত করে। সব ভালবাসাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় ভগবানে।

বিয়োগে প্রিয়জনকে ভগবানের মধ্যে অনুভব করাই একমাত্র সান্ত্বনা। বুদ্বুদ ভেসে যায়, আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। বুদ্বুদের অস্তিত্বের পিছনে যদি সমুদ্রকে দেখি তাহলে সে নাই, এ কথা বলতে পারি না।

তিনি আছেন। যিনি পরম পিতা, পরম প্রিয়, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে আছেন। মিলনে যা সীমিত প্রাপ্তি ছিল, বিচ্ছেদে আজ তা অসীম হ'ক।

*

প্রদীপের শিখা যে-মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, একটা অতর্কিত বিস্ফোরণে সেই মহাশূন্য হতেই বেরিয়ে আসে, যতক্ষণ সে জ্বলে, সে-ও শূন্যের মধ্যেই। অথচ এ কথাটা সে কত স্বচ্ছন্দে ভুলে থাকতে পারে। আশ্চর্য না ? তোমার জীবনে এই শূন্যের জয় হোক।

*

ঈশ্বরের আত্ম-পরিস্পন্দনই কর্ম। এই কর্মবশে জীবচেতনা অবিদ্যা হ'তে নানা উঁচু-নীচু অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে তলিয়ে দিতে পারলেই কর্মরহস্য বোঝা যায়। এ-জন্মের সম্বন্ধের জের পরজন্মে থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। ঈশ্বরানুভব ছাড়া কর্ম-বন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়া যায় না।

*

সন্ন্যাসীর দেহত্যাগকে জয়ধ্বনি দিয়ে গ্রহণ কর এবং যথাশক্তি তাঁর পথের অনুবর্তন করবার চেষ্টা কর। শোক করো না। এ-ক্ষেত্রে শোক অথবা শাস্ত্রের কচকচি — সবই বাহুল্য এবং তাঁর স্মৃতির অপমান।

*

সন্ন্যাসীর ধর্ম আত্মস্বরূপের মনন। 'বড়দা', 'সত্য-ভাই' — এ-সবই কায়িক সম্বন্ধ। এমনকি গুরু এবং শিষ্যও তাই। অতএব সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের পর তিনি যে-স্বরূপে লীন হয়ে গেছেন, সেই স্বরূপের মনন করাই তোমাদের কর্তব্য। তিনি যে-ভূমিতে আরোহণ করলেন, 'সে বড় বিষম ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।' কে তাঁর বড়দা, কে তাঁর সত্য-ভাই ? সর্বত্র শুধু এক অখন্ড ব্রহ্মানন্দ।

*

আজ দু'দিন ধরে সন্ধ্যার আকাশ হচ্ছে অপরূপ। আলো আর কালোর এমন মিতালি — পিছনে অবাধ শান্তির পটভূমিকা। এ তো অন্তরীক্ষের খবর। তারও ওপারে দ্যুলোকের দ্যুতি।

তাকে চোখ বুজে বুকের মধ্যে অনুভব করা যায় যেন । হওয়াটাই একটা অপরূপ বিস্ময়, তাই না ?

*

সমস্যার নামই হল জীবন । সমস্যা মিটে গেলে মরণ, অথবা মরলেই সমস্যার সমাধান । দুয়ের মধ্যে আছে একটা জ্যান্তে-মরার অবস্থা । সেটাই জীবন্মুক্তি । তার জন্য সচেষ্ট থাকাই বৃহত্তর জীবন ।

*

জীবনের পিছনপানে ফিরে তাকিও না । যা গেছে, তা গেছে । তার স্মৃতি ''ভূত'' হয়ে তোমার কাঁধে যেন ভর না করে । তুমি আলোর দুলাল — সবিতার দিকে মুখ করে চলেছ, আর তোমার ছায়া তোমার পিছনে-পিছনে ছুটছে । আলোর দিকে পিছন ফিরে ছায়ার পিছনে-পিছনে ছুটো না ।

*

আমরা সবাই তাঁর যন্ত্র এবং বিভূতি । তিনিই আমাদের মধ্যে নিজেকে বীজাকারে গুটিয়ে আবার বনস্পতি আকারে বিস্ফারিত করছেন । এখানে আর ওখানে যে একই সত্তার অভিব্যক্তি, মানুষ নির্দিষ্ট কালে তা 'আত্মনি বিন্দতি' ; তখন রোগ বা আরোগ্য, জীবন বা মরণ সব একাকার হয়ে যায় — রামকৃষ্ণের ক্যানসারের রসও তখন অখন্ড সচ্চিদানন্দেরই রস । তিনিই সাপ হ'য়ে কামড়াচ্ছেন, আবার ওঝা হ'য়ে ঝাড়ছেন । এখানে আর ওখানে ভেদ নাই — 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' — এ উপনিষদেরই কথা । এই অভেদজ্ঞান মনের চেষ্টায় হয় না — এ পাওয়া যায় বোধে বা বোধিতে । এর আভাসটুকুও যদি আমাদের মধ্যে জাগে, কৃতজ্ঞতায় অন্তর তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে — তখন অনিঃশেষে আত্মসমর্পণই একমাত্র ধর্ম হয়ে যায় ।

আপনার পিতা তাঁর মধ্যেই দেবযানের পথ বেয়ে চলেছেন !

*

ঘুমকে বোঝবার চেষ্টা করলে মরণের রহস্য বোঝা যায় । জীবন যেমন একটা চেতনা, মরণও তেমনি একটি চেতনা । জাগ্রৎ যেমন একটা চেতনা, সুষুপ্তিও তেমনি একটা চেতনা । জাগ্রতে জগৎ থাকে । সুষুপ্তিতে থাকে না । কিন্তু আমি তো থাকি ।

জাগ্রৎ আর সুষুপ্তির মাঝে আছে স্বপ্নের কল্পলোক । তেমনি জীবন আর মরণের মাঝে আছে পরলোক ।

অনেক স্বপ্ন আমাদের বাস্তব চেতনারই উপসৃষ্টি বা বিকার। তেমনি পরলোকও কখনও-কখনও জীবনেরই একটা স্বপ্ন-বিজৃম্ভণ হতে পারে।

কিন্তু ধ্যানের জগৎ আর ধ্যানের সুষুপ্তি — যাকে যোগের ভাষায় বলা যেতে পারে চেতনসমাধি আর জড়সমাধি — দুয়ের মাঝে আছে ভাবলোক, যা চিত্তকে অন্তর্মুখী ক'রে আমরা যাই ধ্যানের গহনে। তেমনি উজ্জ্বল মরণের পরও আমাদের মাঝে জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বলোক ফুটে উঠতে পারে।

নিদ্রা আর মৃত্যু — দুয়ের রহস্য ভেদ করতে হলে জাগ্রৎকে উজ্জ্বল করতে হবে। যদি না করি অবশে মরব, স্বপ্নের ঘোরে স্বর্গ-নরক ভোগ করব, আবার এই পৃথিবীতে জেগে উঠব। আর যদি স্বরূপে মরি, তাহলে ঊর্ধ্বগতি বা উৎক্রান্তি হবে সজ্ঞানে, কিংবা এই পৃথিবীর সঙ্গে চিন্ময় যোগ ঘটবে।

পরমের স্পর্শ পেতে হলে নিজেকে শূন্য কর। চোখ বুজে অনুভব কর, তিনি তোমায় ছুঁয়েই আছেন। তুমি তাঁর বুকে ঘুমিয়ে পড়, আবার জেগে উঠে তাঁর মুখের পানে তাকাও, কখনও হয়তো তাকাও বাইরের দিকে। কিন্তু তিনি অতন্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তোমার পানে। তাঁর এই অপলক দৃষ্টিকে জাগ্রতের প্রতি-মুহূর্তে বহন কর, শরীরের অণু-পরমাণু দিয়ে — পরমের স্পর্শ পাবে। বাইরের দিকে দুটি হাত বাড়িয়ে কিছুকেই জড়িয়ে ধরো না, তাঁর দিকে ফিরে তাঁকেই জড়িয়ে ধর — জড়িয়ে ধর সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিরহে — তিনি যে তোমায় গভীর মমতায় জড়িয়ে আছেন, তা অনুভব কর। এই তো পরমের স্পর্শ।

*

মৃত্যুতে শোক করো না। ওটা মূঢ়ের লক্ষণ। তুমি যে-আলোর মেয়ে, সেই আলোতে চরাচর ব্যাপ্ত। জীবন তারই মধ্যে বুদ্বুদের মত ফুটছে আর ডুবছে। সবারই অন্তিম মুহূর্ত ওই আলোর সমুদ্রে লয় হয়ে যাক্ — এই প্রার্থনাই করো। একদিন তুমিও ওই আলোতে লয় হয়ে যাবে, আমিও যাব। এই আলোর চেতনাই তো সত্যকার চেতনা। তার মধ্যে তো মৃত্যুভীতি নাই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়াতেই ভগবান এই শিক্ষা দেন নি কি ?

*

মৃত্যুর অনুভূতি হওয়াটা খুবই ভাল। একদিন তো ওই শূন্যতায় সবাইকেই ঝাঁপ দিতে হবে। এই অনুভূতিটা প্রথম যখন আসে, তখন একটু অস্বস্তি হয়। কিন্তু ক্রমে ওটা সহজ হয়ে যায়। জীবন এক পরম শূন্যতা থেকে উৎসারিত হচ্ছে — এই বোধেই আমাদের ভয় উদ্বেগ সব দূর হয়ে যায়, জীবনের শক্তি ও ঐশ্বর্যের সন্ধানও তখন পাই।

*

অজ্ঞানীর মৃত্যু হয় আলো থেকে আঁধারে যাওয়ায় । আর জ্ঞানীর মৃত্যু আলো হতেই আলোতে উত্তরণ । ভোরের শুকতারা মিলিয়ে গেল সবিতার আলোর প্লাবনে । ওটা মহামরণ না মহাজীবন ?

*

অনন্তের পথ অফুরান । সহস্র জীবন ধরে তাঁকে পাওয়া — এর কি শেষ আছে কখনও ? পৃথিবীতে বারবার আসতে ভয় কিসের ? দেখছ না, বসন্তের ফুল বারবার ফিরে আসছে আলোর প্রসাদ নিয়ে ? এই আলোই মুক্তি । মা-ই আলো । মার দিকে তাকাও — চিত্ত প্রসন্ন হ'ক ; সব বন্ধন আপনা থেকে খসে যাক্ — আলোর মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক আলোর বুকে । এই মুক্তি প্রতিমুহূর্তে, স্মৃতি আর ভাবনার বিদ্যুৎ-ঝলকে । যখনই মাকে ভাবছ, দেখছ — তখনই তুমি মুক্ত ।

*

মৃত্যুকে ভয় বা নিরানন্দের চোখে দেখো না । আমরা মৃত্যুর বাহিরটাই দেখি বলে ওটাকে কষ্টের বলে মনে করি । কিন্তু আসলে মৃত্যু হল চেতনার প্রশম । বহিশ্চেতনায় একটা আলোড়ন ওঠে বটে — কিন্তু তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না । ওই সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের আকর্ষণের মতই মায়ের অসীম চেতনার স্রোত তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছে । তিনি মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়েছেন । আশ্রমে সবার মৃত্যু এইভাবেই হয় । সুতরাং ওটাকে বিরূপদৃষ্টিতে দেখা তো উচিত নয় ।

*

জীবন থাকতেই মরণকে চিনে নেওয়া উচিত । বোঝা উচিত মরণ মানেই আলোর সমুদ্রে মিলে যাওয়া, মায়ের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া । এইটি দু'জনে ধারণা করবার চেষ্টা করো । তাহলে আর দুঃখ থাকবে না, ভয় থাকবে না ।

*

বাইরের দিকে তাকিও না । একদিন চোখ বুজতেই হবে সবাইকে । সেদিন বাইরের আলো-ছায়া থাকবে না । কিন্তু অন্তর যেন আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে । তারই জন্য প্রস্তুত হয়ো ।

*

মৃত্যুর পরের অবস্থা সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করে লোকে । আসলে অবস্থাটা ঘুমিয়ে পড়ার মত, এইটা জেনে রাখাটাই ভাল । ঘুমের সময় আমাদের চেতনা বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে এসে ভিতরে শান্ত হয়ে যায় । জাগ্রতে যাদের চিত্ত শান্ত থাকে, ঘুমের সময় তারা বিশেষ স্বপ্ন দেখে না । কেউ-কেউ বিজ্ঞানভূমির নানা অনুভূতিও পায় । তেমনি হয় তাদের মৃত্যুও । মৃত্যুর পূর্বক্ষণে যোগীর ভিতরটা আলো হয়ে ওঠে, চেতনা গুটিয়ে আসলে তা তো উজ্জ্বল হবেই । তার পর সেই উজ্জ্বল আলো যেন প্রশান্ত নীলাকাশের মাঝে তলিয়ে যায় ।

মাকে যদি আত্মসমর্পণ কর, চেতনাকে শিশুর মত স্বচ্ছ ও শান্ত রাখ, তাহলে তুমিও এমনি করে মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে । এখন থেকে ঘুমের সময় মায়ের হৃদয়ের প্রশান্ত সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছ — এই ভাবনাটি যদি অভ্যাস কর, মৃত্যু সহজ ও সুন্দর হবে ।

মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল । কিন্তু মৃত্যুকে একটা ভয়ের কিছু বলে ভাববে না । মৃত্যু শান্তি, মায়ের বুকের আলোতে মিলিয়ে যাওয়া । শুকতারার মৃত্যু হয় সূর্যের আলোতে, বুদ্বুদের মৃত্যু হয় যেমন সমুদ্রের বুকে, তেমনি করে মৃত্যু-ভাবনায় অভ্যস্ত হতে হবে । মনে হতাশা রেখো না কখনও । প্রতি-মুহূর্তেই তুমি তাঁর হয়ে উঠছ — এর মাঝে জন্ম-জন্মান্তরের কোনও কথা তো নাই ।

*

চিত্তকে আকাশের মত প্রশান্ত রেখো । মৃত্যু দেখে বিচলিত হয়ো না । মৃত্যু ঘুমের মতই পরম প্রশান্তি, আবার যেন মায়ের বুকে ফিরে যাওয়া । বেঁচে থেকেও যে মরে থাকতে পারে, তার বাঁচাই সত্যকার বাঁচা । তুমিও এমনি ‘জ্যান্তে-মরা’ হবার সাধনা কর । জীবনে কি পেলে, কি না পেলে তার হিসাব করো না । আকাশের বুক তো পাতাই রয়েছে সবার জন্য । কিন্তু তাকে তো কেউ চায় না ।

*

মৃত্যুকে ভয় করবার কিছুই নাই । প্রতিদিন আমরা ঘুমিয়ে পড়ি । এমনও হতে পারে, সে-ঘুম আর ভাঙল না । তাতে কি আমাদের কোনও ক্ষতি হবে ? মৃত্যুটাকে এমনি আরামে ঘুমিয়ে পড়বার দৃষ্টিতে দেখে মৃত্যুভাবনায় অভ্যস্ত হও । মৃত্যুর পর লোকান্তর বা জন্মান্তর ইত্যাদির ভাবনায় নিজেকে চঞ্চল করো না । সন্ধ্যার আলো যেমন ধীরে-ধীরে আকাশে মিলিয়ে যায়, তেমনি তোমার চেতনা সেই অসীমে মিলিয়ে যাবে — এইটাই এখন ধারণা কর । তারপর যদি চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে বা আবার দিন হয় — না হয় হবে । এখন কেবল নিজেকে অনিঃশেষে তাঁর মাঝে মিলিয়ে দেওয়া ।

*

প্রকৃতির লক্ষযুগের তপস্যায় মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের একটুমাত্র আভাস দেখা দিয়েছে। দেবতা হতে তাকে এখনও আরও লক্ষযুগ অপেক্ষা করতে হবে হয়তো। ততদিন রোগ আর মৃত্যু তাকে ছেড়ে যাবে বলে মনে হয়না। তবে সে তাদের ঊর্ধ্বে যাবার জন্য চেষ্টা করবে নিশ্চয়। দুটা-একটা আকস্মিক মৃত্যু সব জায়গাতেই হয়। মেয়েটি আগুনে পড়ে মারা গেল — এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। ছেলেটি তো মারা গেল নিজের বুদ্ধির দোষে। আশ্রমে আমরা নিরাপদ থাকব — এ আশা করা অন্যায় নয়। কিন্তু তার জন্য আমাদেরও তো প্রস্তুতি থাকা দরকার। সে-প্রস্তুতি কি সবার আছে ? যাদের নাই, তাদের অবস্থা আশ্রমের বাইরেও যা, ভিতরেও তা — যদিও মায়ের শক্তি অহরহ তাদের কল্যাণের পথে নিয়ে যাবার জন্যই কাজ করে চলেছে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমরা যদি সহযোগিতা না করি, তাহলে তাঁর শক্তি সক্রিয় হয়না। তিনি তো জোর করে কিছু করবেন না, কেন না অধ্যাত্মশক্তি জোর জবরদস্তির ব্যাপার নয়। সূর্যের আলো তার ছোঁয়াতেই ফুল ফোটায়, ফুলের উপর জোর খাটায়না।

*

দুঃখ শোক জরা ব্যাধি মৃত্যু — এগুলি অপরা প্রকৃতির খেলা। আগের দুটি মনের, পরের তিনটি দেহের। মনের উপরে উঠে যাওয়া যায়, কিন্তু দেহের উপরে ওঠা অত সহজ নয়। জরা আর ব্যাধিকে যদিও-বা ঠেকিয়ে রাখা যায়, মৃত্যুকে ঠেকানো এখনও সম্ভবপর হয়নি। যে-দেহ প্রাকৃত নিয়মে তৈরী হয়েছে, প্রাকৃত নিয়মেই তা ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ দেহে যে আত্মা বা চৈতন্য, তা অবিনাশী, বারবার দেহ বদলিয়ে-বদলিয়ে চলেছে যে-জীবচৈতন্য, তা-ও উপরের স্তরে — যেমন প্রবুদ্ধ মানুষের মাঝে। কিন্তু এই দেহকে অবিনাশী তো বলতে পারি না। অথচ দেহের অণু-পরমাণুগুলি অবিনাশী। যদি আত্মচৈতন্য দ্বারা দেহের এমন পরিবর্তন আনা যায়, যাতে তার অণু-পরমাণু স্বভাবেই চৈতন্যের পরিপূর্ণ বাহক হয়, তাহলে সে-দেহও অবিনাশী হতে পারে। তাও এক কল্পকাল স্থায়ী হওয়াই সম্ভব। কিন্তু সে-রকম দেহ এখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে কিনা জানি না। মানুষ চেষ্টা করে আসছে অনেক দিন ধরে। সফল হয়েছে কোথায় ? তবে আমার মনে হয়, এসব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা না করে আত্মচৈতন্যকে পরিস্ফুট করবার সাধনা করাই আমাদের উচিত। মনের দুঃখ-শোক দূর হ'ক সম্পূর্ণভাবে, যথাসম্ভব শরীর সমর্থ আর নীরোগ থাকুক, মৃত্যু গাছের পাতা ঝরার মত সহজ হ'ক — এটুকু চেষ্টা তো আমরা সবাই করতে পারি। তারপর দেখা যাবে, আরও-কিছু করবার হুকুম আসে কি না উপর থেকে।

*

ভয় আসে চিত্তের সঙ্কোচ থেকে, দেহ, সংসার, জীবন, প্রিয়জন সবাইকে আঁকড়ে থাকবার মোহ থেকে। চিত্তকে আকাশের মত উদার কর, কোথাও কোনও-কিছুকে আঁকড়ে থেকো না, তাহলে ভয়ও থাকবে না। তুমি সেই শাশ্বত চৈতন্য ও আনন্দের প্রতিমা — তোমার ভয় কোথায় ? ...

আমাদের সাধনা মৃত্যুঞ্জয় হবার সাধনা। মৃত্যুকে ভয় করলে তো চলবে না। দেহের মৃত্যু হবেই, কিন্তু নিজেকে তৈরী করতে হবে এইভাবে যে সেই চরম ক্ষণটি যখন আসবে, তখন

ভিতরটা যেন সূর্যের মত জ্বলে ওঠে । একে বলে যোগীর 'বৈবস্বত-মৃত্যু' । জীবন যদি সূর্যের মত জ্বলে, তবে মৃত্যুও জ্বলবে ।

নিজেকে তাই অহরহ অনুভব করবে, তুমি আলোর মেয়ে । তোমার জীবন-মরণ দুই-ই আলো ।

*

যদি বুঝেই থাক, তোমার যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে তাহলে তার জন্য প্রস্তুত হও । মা-ই তোমার শরণ — যেমন জীবনে, তেমনি মরণে । জীবনরূপে তাঁকে তুমি পেলে না । জীবনের বিরুদ্ধে তোমার অনেক নালিশ থেকে গেল । এবার তাঁকে মরণরূপে বরণ করে নাও । চলে যেতে হলে প্রসন্ন-চিত্তে চলে যেও । কোনও ক্ষোভ রেখো না । কারও দিকে তাকিও না — শুধু ঘনিয়ে-আসা আঁধারের মধ্যে দেখ প্রশান্ত-করুণ মায়ের মুখ ।

*

বেঁচে থাকতেই মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াটা খুব ভাল । মৃত্যুকালে খানিকটা দৈহিক কষ্ট হতে পারে, যদি অকালমৃত্যু হয় । যেমন কাঁচা ফল ছিঁড়তে গেলে বোঁটায় লাগে । তেমনি কিন্তু পাকা ফলের বোঁটার বাঁধন আগের থেকেই আলগা হয়ে যায় ।

দেহটা না পাকলেও যদি মনটা পেকে যায় অর্থাৎ মনটা যদি আত্মসমর্পণের ফলে সুশান্ত হয়ে যায়, তাহলে মৃত্যুকালে কোনও কষ্ট হয় না । ব্যাপারটা হয় অনেকটা ঘুমিয়ে পড়বার মত । ঘুম, সমাধি আর মৃত্যু তিনটাই এক পর্যায়ের বস্তু । তোমার অনুভবের শেষের দিকটায় যে একটা অনাবিল শান্তির ভাব এসে গিয়েছিল, সেটাই হল আসল কথা । যদি জাগ্রতেও এই শান্তি বজায় রাখতে পার সবসময়, তাহলে মৃত্যু হবে যেন ঘর থেকে বের হয়ে বাহিরের মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ানো ।

*

জীবনে অনেক জটিলতা আছে জানি, আমারা যা চাই তা সবসময় পাই না । কিন্তু এ সব ব্যাপারকে কোনকালেই খুব বেশী গুরুত্ব দিতে নাই । যা ঘটবার তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটছে — তুমি কেবল দেখে যাচ্ছো । স্রোতের টানে ভেসে চলেছ — মহাসমুদ্রের আহ্বান শুনছ দু'কান ভরে — ব্যস, তার পরে তো আর কিছুই নাই ।

*

জ্যান্তে মরা হয়ে থাক । জীবনকে আঁকড়ে থেকো না, বা তার প্রতি কোনও আসক্তি রেখো না । ভাব, যেন তুমি মায়ের বুকে ঘুমিয়ে আছ । তাঁর হৃদয়ের তালে-তালে তোমার হৃদয়

দুলছে । এই দোলাই জীবনের সত্য । আর সব দুঃস্বপ্নমাত্র । মরে তাঁর মধ্যে বেঁচে ওঠ । তবেই এখানকার বাঁচা সার্থকতায় পৌঁছবে ।

*

শরীরকে বাধা মনে করো না । শরীর তো একদিন থাকবে না । যত দিন এগিয়ে যাবে, ততই তার সামর্থ্যে ভাটা পড়বে । কিন্তু মন যেন সবসময় উজান যায় । জবরদস্তি করে উজান যাওয়ার কথা বলছি না । তাতে প্রতিক্রিয়া আরও খারাপ হবে । উষার আলোর মত নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলে একদিন নিজের অজানতে — যখন বালিকা ছিলে । আবার সেই বালিকাটিকে ফিরিয়ে আন । এবার সন্ধ্যার আলোর মত নিজেকে ছড়িয়ে দাও তাঁর আকাশবৎ বিশাল হৃদয়ে । দিনের আলো যেমন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়, তেমনি মিলিয়ে দাও — আকাশে, জলে-স্থলে, বিশ্বভুবনে, সবার মধ্যে ।

*

... জগতে ভয় করবার কিছু নাই । মানুষের আত্মা অভয় ।

যে-দেহ পার্থিব উপাদানে গড়া, তার মৃত্যু তো হবেই । কিন্তু পার্থিব উপাদানকে যদি অপার্থিব করতে পারা যায় যোগের শক্তিতে, তবেই মৃত্যুজয় সম্ভব । কিন্তু সে কয়জনে পারে ? চিরকাল জেনে বুঝে বা না-জেনে না-বুঝে মানুষ সে চেষ্টা করে এসেছে বটে । কিন্তু তার ফল ফলতে এখনও ঢের দেরী । তাছাড়া যদি কেউ এই দেহের রূপান্তর ঘটাতে পারেন, তাহলে কি সবাই বিনা সাধনায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে ? ফাঁকি দিয়ে কোনও-কিছুই পাওয়া যায় না ।

*

মানুষ মরবে না তো কি ? ধর, তুমিই কি এই রকম অশান্তির মধ্যে চিরজীবী হতে চাও ? মরে আবার নতুন করে জন্মে একটা নতুন সুযোগ পাওয়াই তো ভালো ।

মরেন না কেবল ভগবান । মরেনও না, তাঁর জরা-ব্যাধিও নাই । কিন্তু সে-ভগবানও যদি জীব হন, তখন ওই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু তাঁকে ছেঁকে ধরে ।

সুতরাং বিজর-বিমৃত্যুও হওয়া যায় জীব যদি ভগবান হয় ।

সে কি কেউ হয়, না হয়েছে ? তার চাইতে মরাই ভাল । আর জরা-ব্যাধি সহ্য করাও ভাল ।

*

তুমি নিঃসঙ্গ, সেই পরমার সঙ্গে এক — মৃত্যুতে এই ভাবনায় অভ্যস্ত হলে জীবন সেই মরণেরই হিরণ্যচ্ছটা হয়ে উঠবে ।

*

বেলাশেষের পূরবী আর গভীর রাতের বেহাগ, তারা সকালের ভৈরবী আর দুপুরের হাম্বীরের চাইতেও কম মধুর নয় । সবই তো সুর । আর সবই অমৃত প্রাণের সুর । এমন-কি মৃত্যুও তাই ।

একটুখানি পর্দার আড়াল রেখে মৃত্যুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে বহুবার । তাই সে আমার অচেনা নয় । কিন্তু এবার পর্দার আড়াল ঘুচিয়ে চোখাচোখি হল তার সঙ্গে । সে আমার মন মজিয়েছে সুধা । জীবনের সমস্ত ভার সে যে এত হাল্‌কা করে দেবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি । মনে হচ্ছে, 'জীবনে আছিনু বাঁধা', এখন সে-বাঁধন কেটে গিয়ে 'তাহারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে' । এ-দেখা মৃত্যুর মাধুরী দিয়ে রাঙানো জীবনের কুঙ্কুম-দৃষ্টি দিয়ে দেখা । এ-যোগ কোনদিন ফুরাবার নয় । এ যেন সেই যে 'দিবীব চক্ষুরাততম্‌' সেই চোখ দিয়ে দেখা । আজ Resurrection-এর মহিমা সমস্ত মর্ম দিয়ে অনুভব করছি । এ শুধু Christ has risen নয়, He is rising—rising—rising—rising for ever ।

এই মৃত্যুর সোহাগ-ভরা ছোঁওয়া তো তুমিও পেয়েছ । তারই স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত থেকো । জীবন সুধাময় হয়ে উঠবে, মৃত্যুর সুধাস্পর্শে অমৃত ।

*

...যে ভাবে তাঁকে পেয়েছিলেন, সেই ক্ষণগুলিতেই 'মধু বাতাঃ ক্ষরন্তি ।' মৃত্যুতে যিনি অমৃতা, তিনিই তো মধুমতী ঋক্‌ । তাঁর ভাবনাতেই নিজের শ্রাদ্ধ নিজে হয়ে যায় — করতেও হয় না ।

*

'কেউ না জানুক, কিছু না থাকুক, তবু তুমি আছ' — এই অতন্দ্র প্রার্থনাতেই আমরা অমৃতের অধিকার পেতে পারি ।

তিতিক্ষায় যে-বীর্য জাগে, তা তাঁরই শক্তি । সেই শক্তির উজানেই শান্তির পারাবার — যা জীবন-মরণ দুয়েরই আশ্রয় ।

*

আমরা বাইরে জরা-মৃত্যুর কবলিত হব একদিন — সে তো জানা কথা । তবু আমরা 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' ।

আজ বেলাশেষের সাগর-তীরে দাঁড়িয়ে দেখছি, জীবনটা একটা বিরাট কল্পমায়া — এইখানেই তার বিরাট সার্থকতা ।

*

সমুদ্রের দিকে যতই এগিয়ে যায়, নদীর গতি ততই মন্থর হয়ে আসে । তার বিস্তার বাড়ে । শেষে নদী সমুদ্রে একাকার হয়ে যায় । ক'দিন ধরে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে । শেষ পর্যন্ত নদীও থাকবে না, সমুদ্রও না । ঊর্ধ্বে এক অসীম আকাশ, কখনও সে আলো, কখনও-বা কালো । এটা আমরা দেখি, কিন্তু, আসলে সে যে কি, কেউই বলতে পারে না ।

একটা অপরিসীম শূন্যতা । কোথাও কোনো-কিছুতে যেন আঁট নাই । কর্মের লক্ষ্য আমাদের সীমিত মনের একটা কল্পনা-মাত্র । ''প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'', বলেছেন উপনিষদের ঋষি । কোথা হতে সব আসছে, আর প্রবহমান প্রাণের স্রোতে থরথর করে কাঁপছে । সেই কাঁপনের একটা লক্ষ্যহীন প্রসন্নতা আছে । আমলকীর পাতাকে ঝিরিঝিরি বাতাসে কাঁপতে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কেন যে কাঁপছে আমলকী, — তা জানে না । যে কাঁপতে দেখে, সে খুশি হয় । কেন খুশি হয়, তা-ও সে জানে না ।

জগতে সবই যেন অকারণ অথচ অবারণ । ভাবতে গেলে মনটা খুশিতে ভরে ওঠে ।

*

একটা কথা বারবার মনে পড়ছে । এবার ব্যাসপূর্ণিমা এবং জন্মতিথি একই সঙ্গে পড়েছে । এই দুইটি একই সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মনে হচ্ছে — ''এবার জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে মুখোমুখি ।'' হৃদয়ের কূলে এবার সোনার তরী ভিড়বার সময় এসেছে ।

হঠাৎ শরীরটা খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাচ্ছে । অথচ কোনো অসুখ নাই — মনটা সীমাহীন উজ্জ্বলতায় প্রসন্ন ।

এতদিন ছুটি চেয়েও পাইনি কারো কাছে, এইবার সত্যকার ডাক এসেছে । আর কেন ?

*

আমার কাজকর্ম যেমন চলবার চলছে তবে লক্ষ্য করছি, বাইরের কাজ থেকে মনটা ক্রমশঃই উঠে আসছে । কাজের সঙ্গে কোনো দিনই জড়িয়ে যাইনি, তবুও, বাইরের কাজের সঙ্গে কর্তব্যবোধের একটা চাপ ছিল । ভিতরে-ভিতরে একটা শ্রান্তি জমে উঠত । এখন মনে হচ্ছে, আমার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে । তবুও কাজ সকলকেই করতে হ'বে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলেছেন । হোক্ তা অভ্যাসবশে । এই অকর্মের অবস্থায় — প্রথমটা একটা শূন্যতার বোধ আসে । সংসারটাকে মায়া বলে মনে হয় । নিজের ছোট্ট গন্ডীর বাইরে — বৃহৎ সংসারটাকে মনে হয় যেন একটা প্রকান্ড প্রহসন । কিন্তু সেখানেও থামতে পারছি না, — মায়াবাদ আমার

জীবনের শেষ কথা নয়, এমনকি লীলাবাদও নয় । এই বোধটাই ভেসে উঠতে চাইছে — কাজ বাইরের নয়, সত্যকার কাজ ভিতরে । সে কাজ হলো, সবিতার মত নিঃশব্দে আত্মবিস্ফুরণ । কোটি-কোটি যোজন দূরের যে প্রজ্বলন মহিমা, তাকে এই দেহের সীমার মধ্যে আস্বাদন করা । জন্ম-মৃত্যু আবর্তনশীল, নিত্যকালের ছন্দটিও উপলব্ধি করতে হবে । পৃথিবীর কাজ সেখানে তুচ্ছ বলে মনে হয় ।

*

মনে হচ্ছে, দীর্ঘকাল বেঁচেছি । আর নয় । এবার অন্তরের আলোকে অনির্বাণ রেখেই কালিন্দীর জলে ডুব দেবার সাধনায় জীবন অমৃত হয়ে উঠুক ।

এবার বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিনে একটি কবিতা লিখেছিলাম । ওই বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে তাঁর জন্ম, সিদ্ধি এবং মহাপরিনির্বাণের তিথি ছিল । জন্ম, জীবনে, মরণে এক অনির্বাণ চেতনার বাহক ওই মহামানবের স্মৃতিতে মন সেদিন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল । মনে হচ্ছিল, আমাদের সবারই জীবন যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীর্থ হয়ে ওঠে প্রতিদিন — জাহ্নবীর প্রাণ আর কালিন্দীর মরণের ধারায় যেন এক যুক্তবেণী রচনা ক'রে সরস্বতীর মহাবিনশনে লুপ্ত হয়ে গিয়ে অমৃত হয়ে ওঠে ।

সেদিন জীবনের সমস্ত অপরিপূর্ণতা এক অপূর্ব চিরন্তন পূর্ণতার আশ্বাসে নিটোল হয়ে উঠেছিল । আজ আমার জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, সেই মহামানবের মহাজীবন আর মহামরণকে স্মরণ করি । সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধের নৈরাত্মরূপিণী প্রজ্ঞাপারমিতা গোপাকেও । একই দিনে একই লগ্নে এঁদের আবির্ভাব হয়েছিল ।

*

জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি একদিন মৃত্যুতে রূপান্তরিত হয়ে যায় । মৃত্যুর শাসনে এই অন্তরাবৃত্তি আপনি এসে পড়ে । বাইরে থেকে ভিতরে গুটিয়ে আসাটাই বড় কথা ... । জীবনের অনুশাসনে যে এমন করে গুটিয়ে আসতে পারে, সে যোগী, — সে হলো সত্যকার মানুষ । তখনও কাজ থাকে, কিন্তু সে-কাজ যেন তাঁর আনন্দযজ্ঞে শরীক হওয়া । করার চাইতে তখন দেখাটাই বড় হয় ।

শিশু যেমন ডাগর চোখে জগৎটাকে দেখে, তেমনি করে এবং তার চাইতেও গভীর করে জগৎকে দেখা । সে-দেখা যেন একটা আকাশজোড়া সোনার কমল একটি-একটি দল মেলে ফুটে উঠছে । কোথাও কোনো নালিশ নাই, কেননা কোনো ব্যস্ততাও নাই — আছে সুগভীর আত্মপ্রত্যয়ের অকুণ্ঠ সমর্থন । এমনি করে দেখে যাওয়া, আর বারবার হারিয়ে যাওয়া সেই নীলাকাশের অসীম নীলে ।

আর কি চাওয়ার আছে ?

*

শিবসূত্রভাষ্যে একটি কথা আছে, ''আনন্দো বিশ্রান্তিঃ'' । কথাটা গভীর ভাবে সত্য । আকাশের বুকে ঝড় ওঠে, কোটি কোটি যোজন জুড়ে সৌরকলঙ্কের বিচ্ছুরণ — কত কাজ, কত কথা, তান্ডবের সাথে লাস্যের মিতালি, ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতন ।

কিন্তু সব ছাপিয়ে এক নিঝুম আকাশ — উদাসীন নয়, প্রশান্ত এবং প্রসন্ন । এই কোলাহলের শেষ পরিণাম সে জানে । বিশ্রান্তিঃ । সব কিছুরই শেষ পরিণাম হচ্ছে বিশ্রান্তিঃ । ভোরের আকাশ কর্মের সূচনায় এই বিশ্রান্তিরই নীরব ঘোষণায় জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে । অহনার কপালে জ্বলে ওঠে শুকতারার উজ্জ্বল তিলক ।

*

মনটিকে সব সময় ফাঁকা রাখবার চেষ্টা করো । সংসারে আমাদের করবার কিছু নাই — ধরবারও কিছু নাই । এই বোধটি চেতনার পটভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলে জীবন সত্তার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । তখন বুঝতে পারবে যে, মহাশক্তির প্রশান্ত বক্ষে এই জীবন-মরণের খেলা, সে শক্তি তুমিই, এবং এই জ্ঞানই অমৃত ।

*

কাজ আমাদের সবাইকেই করতে হবে । যার যেমন কাজ । কিন্তু কাজ বলতে কি বোঝায় ? সে যেন একটা শক্তির স্রোত, এই আধারের মধ্যে । দুটি কূলের বন্ধনীতে আটকা পড়ে, খর-বেগে বয়ে চলেছে — পড়বে গিয়ে সমুদ্রে । এসেছিল হৈমবতীর আকাশ হতে, গঙ্গোত্রী হতে, কিংবা মানস সরোবর হতে । তাই, দুটি আদি-অন্তই সত্য, আদিতেও ভূমা, অন্তেও ভূমা । মাঝখানের এই খর-স্রোত, আনন্দের স্রোত । এই কথাটি মনে রেখে বয়ে চলতে হবে । নদীর কূল নদীকে বাঁধে না, নদী সদানীরা, মুক্তধারা ।

*

নদীর স্রোতে খড়কুটা কত-কিছু তো ভেসে চলে যায় । তার সবই যে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে — তা তো নয় । কিন্তু স্রোত সমানে বয়ে যেতেই থাকে, আর সে সমুদ্রেও গিয়ে মেশে ।

স্রোতের কোন রঙ নাই, আবর্ত-তরঙ্গ-বুদ্বুদের উপাধি — থেকেও নাই । আছে শুধু নিঃশব্দ একটা গতি, সাগরসঙ্গমের একটা ধ্রুবতা । আমাদের সবার জীবনই তাই নয় কি ?

সব উপলক্ষ্য ভুলে যেতে হবে । অন্তরের গভীরে শুধু এই নিঃশব্দ সমুদ্রাভিসারিণী গতিকে অনুভব করতে হবে ।

*

''শান্তি-সমৃদ্ধম্ অমৃতম্'' — জীবনের এই হল শেষ কথা। একথা মৃত্যুতেও সত্য। সেই কথাটা বারবার চিন্তা করতে হবে, বুদ্বুদ মিলিয়ে যায়, কিন্তু সমুদ্র থাকে। সে যদি এইটুকু জানে, সে সমুদ্রের বুকেই ছিল, আছে এবং থাকবেও, তাহলেই তার জীবনের সার্থকতা, অস্তিতা এবং নাস্তিতাতেও।

*

আমার জীবনের সূর্য এখন অস্তের কূলে ঢলে পড়েছে। কিন্তু এতো হল বাইরের খবর — যে-দেহ জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর দ্বারা কবলিত, তার দুর্ভোগের পরিচয়।

পৃথিবীতে থেকে সবিতার এই রূপই আমরা দেখি। কিন্তু দ্যুলোকের সবিতা নিত্য-দীপ্ত, তাঁর সাবিত্রী বিজর-বিমৃত্যু মহাশক্তিরূপিণী। তাঁদের এই মহিমার অনুধ্যানই আমাদের কৃত্য। এই-স্বরূপের সন্ধানে নিত্য-ভাস্বতী হও।

*

যেখান থেকে আমরা এসেছি, আবার সেখানেই সবাই ফিরে যাব, সেখানেই আমাদের হারাধন খুঁজে পাব। এপারে-ওপারে কোনো ভেদ নাই — ভেদ নাই। বাইরে, ভিতরে, জীবনে, মরণে সবই এক। ইষ্ট-ভাবনায় সবই অমৃতময় বোধ হয়।

আমার শরীর ভাঙছে। জীবন আর মরণ যুগলধারার মতই — ভাগীরথী আর কালিন্দীর ধারা ত্রিবেণীতে অদৃশ্য সরস্বতীর ধারার সঙ্গে মিশে — সাগরসঙ্গমে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চলেছে। এই ভাবনার বিশালতা, স্তব্ধতা আর প্রসন্নতা অমৃতের অভিষেকে সব পূর্ণ করে তুলছে।

*

ত্রিবেণী-সঙ্গমের একটা অপূর্ব মাহাত্ম্য আছে। যে-ত্রিবেণী ভারতবর্ষের অধ্যাত্মভাবনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যোগে, তন্ত্রে, হিমালয়ের তীর্থে-তীর্থে এই ত্রিবেণীর মহিমা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আমাদের দেহের এই নাড়ী-তন্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা, আর দুয়ের মাঝখানে সুষুম্না-প্রণালীর ভিতর দিয়ে, মূলাধার হতে সহস্রার পর্যন্ত অমৃত প্রাণস্রোতের উজানধারার কথা সাধনশাস্ত্রে পাওয়া যায় ; তার অভ্যাসও বহু-প্রচলিত। এই তত্ত্বগুলি আমার কিছু লেখার মধ্যে আছে।

দুটি ত্রিবেণী এদেশে মুখ্য — এক হলো প্রয়াগের ত্রিবেণী, আর এক ত্রিবেণী কামাখ্যার সতী-তীর্থে, বশিষ্ঠের ত্রিস্রোতায় — যেগুলির নাম, কান্তা, ললিতা ও সন্ধ্যা।

উত্তর ভারতের ত্রিবেণী — যমুনা, গঙ্গা এবং সরস্বতী — তিনটি ধারা শেষ পর্যন্ত এক হয়ে, সমুদ্রে গিয়ে মিলেছে। আর পূর্ব ভারতের ত্রিবেণী, ব্রহ্মপুত্রের ধারা বেয়ে, বাংলার সমতটে গঙ্গায় লুপ্ত কালিন্দীর সঙ্গে এসে মিশেছে। আমি একে ব্রহ্মপুত্র ও কালিন্দীর মিলন-সঙ্গম বলে মনে করি।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদের একটি কথা মনে পড়ছে, ''হংসঃ শুচিষৎ'' হতে হবে, অর্থাৎ — ''সমনস্কঃ সদাশুচিঃ'' হয়ে, মানসের নীল জলে সন্তরণ দিতে হবে । এই নীলাভা, — কালিন্দীর নীলজলেও আছে ; মৃত্যুর নীলধারা সে । অদ্ভুত স্রোতস্বিনী এই যমুনা । যেন রাধিকার চির-কৈশোরের উপচ্ছায়া — আমি একে কাজরীও বলি । সে যেন দারু-ব্রহ্মময়ী প্রতিমা, যার মর্ত্যরূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে চিন্ময়ী, সুরূপা, সুতনুকার অপরূপা মূর্তি ।

*

মৃত্যুর রূপ একদিকে শূন্যতা, কিন্তু তাই আবার পরম পূর্ণতার ভিত্তি-ভূমি । প্রিয়জনকে জীবনে আমরা পাই খন্ডখন্ড-রূপে, — আমাদের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার ও অহমিকার তৃপ্তি হয় তাতে । কিন্তু মরণে তাঁকে পাই অনন্তের রূপে । চোখের আড়ালে যিনি চলে গেলেন, তিনিই আবার ধ্রুবা স্মৃতিরূপে অনির্বাণ দীপ্তিতে জ্বলে উঠলেন অন্তরে । তখন আর ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে পাই না, পাই সমস্ত চেতনা দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে । সান্তের স্মৃতির ভিতর দিয়ে স্পর্শ করি অনন্তকে । সেই অনন্তস্বরূপই তো সান্তের বেষ্টনীতে সঙ্কুচিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন । সেই সঙ্কোচের মাঝে তাঁকে পাওয়া, তার একটা আশ্বাস ও আনন্দ আছে, তা স্বীকার করি । কিন্তু অনন্তের রূপে কাউকে না পেলে, পাওয়া কখনো পূর্ণ হয় না ।

*

জীবনে আমাদের অশেষ জটিলতা আছে — তা থাক । কিন্তু অন্তরকে আমরা যেন নূতন রূপে সৃজন করতে পারি । বিশ্বের প্রাণ স্রোতের মত বয়ে চলেছে । সেই স্রোতের বুকে নিজের বোঝাই তরী ভাসিয়ে দিতে পারলে, তার ভার আর বোঝা যায়না ; কিন্তু ডাঙার উপর দিয়ে একটা সামান্য বোঝা টেনে নিয়ে যেতে হলে আমরা শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ি ।

বিরাটকে অনুভব কর, ধাবমান প্রাণের স্রোতের মত — সেই স্রোতের বুকে নিজেকে ভাসিয়ে দাও । প্রতি-মুহূর্তে শোন সুদূরের আহ্বান । একটা বৃহৎ এবং অসীমের অনুভবই তো জীবনের পাথেয় । মুক্তি ওই আকাশে, যে-আকাশ তোমার বাইরে, তোমার অন্তরে ।

*

অন্তরের শূন্যতা একটা সম্পদ্ । এই শূন্যের মাঝে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারো, — জীবনের কোনো চাওয়াই অপূর্ণ থাকবে না, কোনো পাওয়াই ফুরাবে না । পরিপূর্ণ পাওয়া শেষ পর্যন্ত ঐ শূন্যতার বোধই নিয়ে আসে । সেই শূন্যের বুকে ফোটে পূর্ণতার হিরণ্যচ্ছটা । জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রেমিকের প্রেম, যোগীর সমাধি — সবই ঐ শূন্যতা । সেই শূন্যতা আকাশের মতই — যার বুকে আছে দিনের আলো, আবার রাতের আঁধার, আছে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ — সবই ।

জীবন-মৃত্যু এখন একাকার লাগছে, — কোনও বন্ধন কোথাও নাই, একথাটা আরও গভীর ভাবে অনুভব করছি। এখন মৃত্যুও অমৃত।

*

বাইরের আকাশ শরতের রৌদ্রকরোজ্জ্বল, কিন্তু মনের শরতেও তো খুশির জোয়ার উঠেছে। সেখানেও শিউলীর সৌরভ, কাশ-ফুলের শুভ্রতা — হালকা মেঘের ছুটোছুটি।

তারই পটভূমিকায় রয়েছে বিরাট এক শূন্যতা ; সেখানে কেউ নাই, কিছুই নাই। অথচ কিছু আছে। এক নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব। উপনিষদের সেই বাণী — ''অস্তীত্যুপলব্ধব্যঃ'' — শুধু অস্তি, এইটুকুই উপলব্ধি করতে হবে। বাইবেলের সেই ''I Am That I Am.'' এই বিশুদ্ধ অস্তিত্বেরই এক দিক, উপনিষদের ভাষায় আদিত্যের ''শুক্লং ভাঃ'' শুক্ল ভাতি ; আরেক দিকে, ''নীলং পরঃকৃষ্ণম্'' — সব কালোকে ছাপিয়ে, এক আশ্চর্য নীলিমা। একটি কৃষ্ণ, একটি রাধা। একটি হর, একটি গৌরী। শুধু কালো নয়, শুধু আলো নয়। কালোয় আলো — আলোয় কালো।

ত্রিবেণীতে গঙ্গার ঢেউএর সঙ্গে যমুনার ঢেউএর মেশামেশি। আর তাদের গভীরে সরস্বতীর সেই গোপনধারা — যা সাদাও নয়, কালোও নয়। সেই হল সবের গোপন সত্তা।

সেই অনির্বচনীয় কালের বৃন্তে ফুটছে অস্তি আর নাস্তির জোড়া-ফুল, — তাদের কর্ণিকায়, কেশরে, পরাগের ঝিলিমিলিতে এই বিশ্ব ভুবন, যার মধ্যে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি চলছে অনন্তকাল ধরে। তাদের সেই মর্মের শূন্যতায় ডুব দিই, মনে হয়, সবই নৃত্যের ছন্দ, অশ্রান্ত, অফুরাণ। এই উপলব্ধি না জাগলে সবই একটা যান্ত্রিক আবর্তন।

কাজ করতে করতে হঠাৎ একসময় একটু শ্রান্তি আসে, হাতের কলম যেন আর চলতে চায়না — তখন বুঝি, ওই কালার বাঁশি বেজে উঠেছে, ডাকছে, ''ওরে, আয়, আয় — তোর ভরা কলসীর জল ফেলে দিয়ে, আবার জল ভরতে ছুটে আয়, আমার বুকে। এখানেই যে তোর পরম শান্তি।''

তখন যদি চোখ বোজ, যদি ভাবতে পারো, তোমার আদি-অন্ত একটা অব্যক্ত শূন্যতা, তারই মধ্যে তোমার অস্তিত্বের ঝিকিমিকি, নক্ষত্রের রিমঝিম্ আলোর মত, — মুহূর্তে অনুভব করবে, প্রাণ কখনও জরাগ্রস্ত হয়না।

*

জীবনে একটাই সত্য। প্রতি-মুহূর্তে কেবল স্রোতের মত বয়ে চলা, প্রতি প্রভাতে নতুন করে ফুটে ওঠা — পিছন পানে কোনোদিনই ফিরে না তাকানো। কেবল ভুলতে ভুলতে যাওয়া — কোথাও কোনো বন্ধনে না জড়ানো।

এটা হল জীবনের গতির দিক। আবার তার স্থিতির দিকের কথাও মনে জাগে। আমি চলছি না — এই মুহূর্তে এইখানে স্থাণু হয়ে আছি। চলছি না বটে, কিন্তু বিস্ফারিত হচ্ছি। আকাশের

মত, আলোর মত । সেই বিস্ফারণের মধ্যে সবাইকে পাচ্ছি, আকাশ যেমন করে পায় । আকাশ-শরীর দিয়ে সত্য আত্মাকে পাওয়া ।

তুমিও যদি তেমনি করে পাও, তবে পাওয়া সম্পূর্ণ হবে ।

চৈতন্যকে কোনও সীমার বেষ্টনীতে তো বন্দী করা যায় না । এই দেহে যদি তাকে ঘনীভূত করি, তবু সে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে । যেমন দীপের শিখা হতে ছড়িয়ে পড়ে আলো । সবই যদি আলো বলে উপলব্ধ হয়, তাহলে সবই তো এক । তবুও পুরুষ এবং প্রকৃতি — এই একটা ভেদ থেকেই যায় । তার জন্য চলতে থাকে, এক ভেঙে দুই হওয়া, আর দুয়ে জড়িয়ে এক হওয়ার বিচিত্র লীলা ।

কিছুদিন পূর্বে, মৃত্যুর যে রিক্ততাকে অনুভব করে এসেছি, সে এখন আমার অস্তিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে আছে — আর সেজন্যই যেন আকাশের সুনীল বৈরাগ্যে সমস্ত মন ছেয়ে আছে । জীবন ফুল হয়ে ফুটছে আর ঝরে পড়ছে । তার কোনও উদ্দেশ্য নাই, অর্থও নাই । বৃক্ষের মত সে স্তব্ধ এবং নিস্পন্দ । তার নাড়ীর গভীরে এক নির্বর্ণ রসের স্রোত বয়ে চলেছে । মানুষ তার অন্তরের গভীরে এই নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে ।

কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না !

*

ইচ্ছা-মৃত্যু না বলে যদি সচেতন থেকে মৃত্যুকে বরণ করা — এই দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে দেখা হয়, তাহলেই বোধ হয় ঠিক হয় । জীবন-মরণ যোগীর কাছে একাকার হয়ে যায় । অসীমের বুকে ঢেউ-এর মত জীবন ; তার ওঠা-পড়া সেই ভূমারই নিঃশ্বসিতের ছন্দ । তাঁর নিঃশ্বসিতকে নিয়ন্ত্রিত করবে, এটা কার ইচ্ছায় সম্ভব হতে পারে ?

''তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ ওঠে,
কুসুম ঝরিয়া যায়, কুসুম ফোটে ।''

তাই, বুঝতে পারছ — সবখানে তাঁরই ইচ্ছার জয় । কবি আবারও বলেছেন —

''আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে ।''

*

কিশোর নচিকেতা যমের মুখোমুখি হয়ে বলেছিল, ''তুমি আমাকে বল, মানুষ এখান থেকে ওপারে গেলে, থাকে — না ফুরিয়ে যায় ।'' যম মৃত্যুর পর চারটি গতির কথা বলেছিলেন ;

(১) মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে যায় ;
(২) বাসনার টানে বারবার পৃথিবীতে যাওয়া-আসা করতে পারে ;
(৩) মহর্লোকে উত্তীর্ণ হয়ে, নিজের আত্মার মহিমাকে অনুভব করে উজিয়ে যেতে পারে ;
(৪) আর ব্রহ্মে সমাপন্ন হতে পারে ।

মৃত্যুর প্রাক্‌কালে যাঁর চিত্ত এই সংসারের মায়িক-বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে, যিনি ওপারের আলোর সন্ধান পান, তিনি আর সংসারে ফিরে না এসে, সেই নিত্য-জ্যোতিতে মিশে গিয়ে — নিখিল বিশ্বকেই নিজের মধ্যে অনুভব ক'রে, আত্মায় পরমাত্মার সাযুজ্য লাভ করেন ।

*

যমই মানুষের আদিগুরু । মৃত্যুকে না জানলে অমৃত হওয়া যায় না । ব্রহ্ম মৃত্যু এবং অমৃত দুয়ের অতীত — দুই-ই তাঁর ছায়া । শুধু ইহজীবনই অমৃত নয়, অনন্ত জীবনই যথার্থ অমৃত । সেই অনন্ত অমৃতকে জানি না বলে আমরা নচিকেতা । চিত্তকে শ্রদ্ধাদীপ্ত কিশোরচিত্ত করে দাঁড়াতে হবে মৃত্যুর সম্মুখে — এই হল শিষ্যের স্বরূপ । আর লোকোত্তর-সত্তায় নিত্যপ্রতিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় যম হলেন গুরুর স্বরূপ । তাই কঠোপনিষদ সনাতন গুরু-শিষ্য-সংবাদ ।

প্রাণের অবক্ষয় জরা, আর প্রজ্ঞার বিলয় মৃত্যু । যাঁর মরণ নাই, নিত্যপ্রজ্বল প্রজ্ঞায় যিনি উদয়াস্তহীন আদিত্যের মত ভাস্বর, তিনিই বিমৃত্যু । তাঁর প্রজ্ঞাবীর্য বা প্রাণ অফুরন্ত — তাই তিনি 'বিজর' । যা 'বিজরঃ', তা সাধারণত চঞ্চল, কিন্তু প্রাণ তখন প্রজ্ঞাহীন, প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ অচঞ্চল, তাই 'বিজরঃ' । কৌষীতকী-উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে 'প্রজ্ঞাত্মক প্রাণরূপী ইন্দ্র' । এই ইন্দ্রপদ আর বিষ্ণুর পরমপদ বেদে একই কথা । সেখানে পৌঁছনই বিজর বিমৃত্যু হওয়া ।

*

মরণের কথা অনেক ভাবিয়াছি, আজও ভাবি । সুতরাং এ-সম্বন্ধে নিজের ভাবনার কথাই তোমাকে বলিতে পারি । তুমি তো জান, আমার অভ্যাস পরখ করা — আমার বিশ্বাসের মূলেও যুক্তি । অতীত বা ভবিষ্যতের বীজ বর্তমানেই নিহিত, ইহাই আমার ধারণা । আমি কর্মবাদী — জগৎটাকে একটা কার্য-কারণের শৃঙ্খলা বলিয়া মনে করি । সুতরাং আজগুবি ও আকস্মিক কিছুকে আমলে আনিতে চাহি না । তাই মৃত্যুকেও আমি জীবন দিয়াই যাচাই করিতে চাই ।

একটা কথা সবার কাছেই সুস্পষ্ট যে মৃত্যু অনুভবগম্য অবস্থা নিশ্চয়ই । যাহা আমার অনুভূতির বাহিরে, তাহার সত্তা-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য কিছু অসঙ্গত নয় । জীবনের যে-অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমার আছে, মৃত্যু তাহারই ক্রমবিকাশ মাত্র । গীতাকারের ওই কথাই বারবার মনে পড়ে —

''দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ।।''

এই দেহের (সঙ্গে-সঙ্গে এই দেহগত-চেতনার) সূচনা, উন্মেষ, স্ফূর্তি ও অবসাদ ছিল, একদিন ইহার প্রলয় ঘটিবে — ইহাতে বিচলিত হইবার কি আছে ? গীতাকারের মৃত্যুর প্রতি এই সহজ

দৃষ্টিটুকু কি তোমার কাছে সুন্দর বলিয়া মনে হয় না ? মৃত্যু-সম্বন্ধে মনকে আগে মোহমুক্ত করা — এইটুকুই তো চাই । আমরা জানি — জীবন আর মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী সত্তা — আলো আর আঁধারের মত । গীতা বলেন, তা নয় — জীবন হইতে মরণ পর্যন্ত একটা পরিণাম (Process) মাত্র । জীবনের বুকে বসিয়াই মরণের আস্বাদন পাইতে পারি এবং তাহা পাওয়ার নামই জ্ঞান, তাই শিবের শিবত্ব ।

মরণের পর আত্মার কি দশা হয়, সে প্রশ্ন কৌতূহলোদ্দীপক হইতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারেই অবান্তর । মৃত্যু-সম্বন্ধে সহজভাবে ও সত্যদৃষ্টি নিয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জীবনের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন । কঠোপনিষদের কথাই ধর না কেন । নচিকেতার গল্পটাতে গোড়াতেই একটা অসঙ্গতি দেখিতে পাও না কি ? নচিকেতা যমের বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মানুষ মরিলে পর কি হয়, পরলোক আছে কিনা, আমায় বলুন ।' অর্থাৎ সোজা কথায়, একজন পরলোকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, পরলোক আছে কি ? এই প্রশ্নটাই অদ্ভুত নয় কি ? নচিকেতার গল্পের গোড়ার এই আপাত-প্রতীয়মান অসঙ্গতিটুকু আমার মনে হয়, ওই মহাসত্যের ইঙ্গিত — ''মরণ কল্পনা-মাত্র, অমৃত জীবনই সত্য — মরণকে যাহারা বুঝিতে চায়, জীবনের বুকে বসিয়া তাহাদিগকে তাহার রহস্য মন্থন করিতে হইবে ।''

তারপর নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যম যাহা বলিলেন, তাহা মরণের সাধনা নয়, জীবনের বেদ । যম যে ''গহ্বরেষ্ঠ গুহাহিত পুরাণ'' সত্যকে দেখাইয়া দিলেন, তাঁহার অমৃতজ্যোতির মাঝে মৃত্যুর ছায়াপাত তো হয় না ! যমের প্রবচনে কোথায় মরণের বিভীষিকা, পরলোকের লোমহর্ষণ চিত্র ? সে বাণীতে যে জরামৃত্যুহীন চিরন্তন আনন্দের সন্ধানই আমরা পাই । মৃত্যুকে খুঁজিতে গিয়া পাই অনন্তজীবন, পরলোকের রহস্য জানিতে গিয়া পাই — ইহজীবনে দিব্যানুভূতির সঙ্কেত !

অতি আধুনিক আর একজন মহাপুরুষের কথা ধর । রামকৃষ্ণদেব পরলোক-সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন ? নন্দ বসু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ''আচ্ছা, পরলোক আছে কি ? মানুষ মরিলে পর কি হয় ?'' তিনি সহজভাবেই বলিলেন, ''শুনেছি যে পরলোক আছে — ঋষিরা বলে গেছেন । কিন্তু আমি বলি, ও সব নিয়ে তোমার এত ভাবনা কেন ? তুমি কি করে তাঁর চরণে শুদ্ধা-ভক্তি হয়, তারই চেষ্টা কর ।'' পরলোক-তত্ত্ব (ইংরেজীতে যাতে Eschatology) বলে, তার সম্বন্ধে বরং বিবেকানন্দের একটা সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ এ-বিষয়ে বলিতে গেলে শিশুর মতই নিঃশঙ্ক । তাঁহার বাণীতে মৃত্যু-বিভীষিকার কোনও চিত্রই আমরা পাই না । Wordsworth-এর সেই বালিকার কথা মনে পড়ে না কি, কবি যাহার-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "A child that lightly draws its breath... what should it know of Death?"

যদি বলি, সমস্ত সাধনার মূল কথাই ওই, মরণ-বিভীষিকাকে জয় করা, মৃত্যু-সম্বন্ধে যে 'অভিনিবেশ' (পতঞ্জলি) তাহার উচ্ছেদ করা, তাহা হইলে বেশী বলা হইল কি ? কথাটা অতি রূঢ় শোনাইবে হয়তো, কিন্তু তবুও বলি — অন্ধ মমতা যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী, তেমনি মরণ-সম্বন্ধেও উহা অশেষ কুসংস্কারের জননী, বহু অযৌক্তিক বিভীষিকার নিদান । নিজের সম্বন্ধেই হউক, অথবা পরের সম্বন্ধেই হউক, আসক্তি যাহার চিত্তে বাসা বাঁধিয়াছে, মরণভীতিও তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে । জ্ঞানের সার্থকতা এই কুসংস্কারের অপনয়নে ।

মরণে বাস্তবিক আমি ভয় করিবার কিছু তো দেখিতে পাই না । কেন মানুষ মরণকে এত ডরায় ? কেহ নিজে মরিয়া দেখিয়াছে কি যে মরণে বড় দুঃখ ? প্রেততত্ত্ববিদের নানা অদ্ভুত কাহিনীর দোহাই আমি মানিতে চাই না, কেননা সে-সব অভিজ্ঞতার মাঝে কতটুকু সত্য, কতটুকু অতিরঞ্জন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই । তাহা ছাড়া, প্রেতের দর্শন কয়জনা পায় ? অথচ মৃত্যু একটা ঐকান্তিক অনুভূতি । ব্যতিক্রম (exception) দিয়া সামান্যের (rule) যাচাই ন্যায়শাস্ত্রের বিধান নয় ।

মৃতদেহ দেখিয়াছি, তাহা হইতে মৃত আত্মার (?) কল্পনা করি কোন যুক্তিতে ? মরণের এ-পারে যে যন্ত্রণা, তাহার অভিজ্ঞতা আমার আছে, সুতরাং ভয় যদি করি তো তাহাকেই করিব । আমার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার যদি অবসান হয় ওই শিববৎ প্রশান্ত দেহের মৃত্যুতে, ওই নিশ্চল নিস্তরঙ্গ অবস্থায়, তাহা হইলে মৃত্যুকে ভয় করিব কেন ?

বাস্তবিক, নিজেকে যখন একা মনে করি, তখন মরণের মাঝে ভয়ের কিছুই দেখিনা । নচিকেতার সুন্দর একটী উপমা মনে পড়ে — ''আগের দিকেও চাহিয়া দেখ, পরের দিকেও চাহিয়া দেখ, যতদূর দৃষ্টি যায়, 'শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ' — ''ক্ষেতের ফসলের মত মানুষ পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে, আবার তারই মত গজাইয়া ওঠে ।'' সমস্ত প্রকৃতি জুড়িয়া নিত্য এই সৃষ্টি-প্রলয়ের লীলা দেখিতেছি — দেখিতেছি, দেহ যায়, কিন্তু ভাব থাকে । মানবসভ্যতা ভাব-সরোবরের লীলাকমল মাত্র — সমষ্টিগত ওই ভাবই আমার মুখ্য প্রাণ, ওইখানে দেহাতীত হইয়াও আমি বাঁচিয়া আছি । অগণিত দেহপাতে তিল-তিল করিয়া বিশ্ব-''ভাবিনীর ভাবের দেহা'' গড়িয়া উঠিতেছে । সে দেহ জরা-মরণের অতীত । জীবনের যদি কোনও সার্থকতা থাকে তো ওই ভাব-তনুতে তনু এলাইয়া দেওয়া । তাতে যদি দেহের মরণ আসে তো আসুক না !

বিপদ কোথায় জান ? ভাব-জীবনকে যত বড়ই করি না কেন, এ কথা ভুলিতে পারি না যে, যতক্ষণ আমার দেহ, ততক্ষণই ভাব । যদি দেহ ছাড়িয়া যাই, তবুও-যে ভাব থাকিবে তাহার প্রমাণ কি ? দেহবাদী Brain ছাড়া চিন্তার অস্তিত্ব কল্পনাই করিতে পারে না । যদিও Brain-এর সঙ্গে চিন্তার, দেহের সঙ্গে আত্মার সত্যিকারের সম্পর্কটা কি, তাহা কোনও জড়বাদীই ভাঙ্গিয়া বলিতে পারেন না । মানিয়া লইলাম, দেহের বিনাশে মনের বিনাশ হয় । তাহা হইলেই-বা দুঃখ কি ? দুঃখ পাইতে হইলেই তো অনুভব থাকা দরকার, আর অনুভব থাকিলেই চিন্তা থাকিবে, চিন্তা থাকিলেই মন থাকিবে । সুতরাং দেহের মৃত্যুতে মনের মৃত্যু, এ কথা যাঁরা বলেন, মরণে তাঁহাদের ভয় করিবার কিছুই নাই ।

কিন্তু মরণ-বিভীষিকা ওই কল্পনা হইতে সচরাচর আসে না । বিভীষিকার হেতু এই — 'মরণের পরও মনটা বাঁচিয়া থাকে, আর তাহাকে কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে হয় ।' যদি তাহাই সত্য হয়, তাহাতেই-বা ভয়ের কি রহিয়াছে ? মরণের পরেও যদি একটা আতিবাহিক-দেহ আর একটা মানসিক-জীবন আবহমান থাকে, তাহা হইলে সে-জীবন তো এই জীবনেরই অনুবৃত্তি । তাহা হইলে মরণ তো সত্যিকার মরণ নয় — গীতার ভাষায়, তাহা দেহান্তর প্রাপ্তি — আর-একটা দেহ পাওয়া ।

*

Death আর Truth একেবারে সমার্থক। সত্যের ক্রমবিকাশ আছে — মৃত্যুরও তাই। মরে-মরে মরণ যেন আর ফুরায় না। সত্যি সত্যি না মরতে পারলে সত্যকে জানা যায় না। ঘুম হচ্ছে নকল মরণ — সমাধি সত্যিকার মরণ। 'এক'-এর অনুভব মানেই মরে যাওয়া।

মাঝে-মাঝে আমার এই মরণ-রোগে পেয়ে বসে, তা বোধ হয় তুমি জান। আবার তাঁর ডমরুধ্বনি শুনতে পাচ্ছি ভাই! তাই আজ কতদিন যাবৎ চুপ করে আছি। জান, যেন জ্বর হয়েছে। অতর্কিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে — এইটা চাই না। তাই এবার Struggle করছি। 'কাজ আছে যে মেলা' — বারবার বল্‌ছি, সে বল্‌ছে, "Let the dead bury the dead — follow thou me"! জানি না, struggle করে পার পাব কি না। কেঁদে বলছি, 'ওগো সহজ করে দাও — জীবন আর মৃত্যুর মাঝে দোলা দাও — একেবারে আমায় কেড়ে নিও না।' জানি না, আমার কান্না সফল হবে কি না।

*

আমি সন্ন্যাসী বলিয়া প্রিয়জন-বিরহের সন্তাপকে ঔদাসীন্যের চোখে দেখিব, এত নির্ম্মম নই; তাই তাঁহার হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথা মর্মে-মর্মে অনুভব করিতেছি। কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গেই অনুভব করি, এই ব্যথারও একটা রূপান্তর আছে। এ-ও সত্যের একটা দিক্, যদিও বড় কঠিন দিক্।

... মরণ একটা সুকঠোর সত্য — যে গিয়াছে, এই সংসারে আর তাহাকে সেইরূপে ফিরিয়া পাইব না, যদিও নাকি জন্মান্তরের ভিতর দিয়া কোনও স্নেহভাজনরূপে আবার সে আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিতে পারে। মানুষ মরে, কিন্তু স্মৃতি তো থাকে! ওই স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া চিত্তকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। মরণে প্রিয়জনের সমস্ত ত্রুটী মুছিয়া যায়, তাহার কান্ত স্বরূপ হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। ওইটী অবলম্বন। ভগবান্‌লাভের ওই প্রথম সোপান। ওই কান্ত রূপকে অবলম্বন করিয়া চিত্তকে ধ্যানে লীন করিয়া দিতে হইবে। জড়রূপে যে আজ চোখের আড়ালে, ভাবরূপে সে-যে হৃদয়ে। ভাবই ভগবান্। প্রথমতঃ রূপ থাকিবে না — কিন্তু ধ্যানে ইন্দ্রিয়শুদ্ধি হইলে দিব্যরূপ ফুটিয়া উঠিবে। সে-রূপের আলোতে চিত্তে জ্ঞানের বিকাশ হইবে — জাগতিক সম্পর্কের চেয়ে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের নিত্যতা উপলব্ধি হইবে। তারপর রূপের পিপাসা একদিন আপনা হইতেই মিটিয়া যাইবে — অখন্ড অদ্বৈত-তত্ত্বে প্রিয়জনের সঙ্গে চির-মিলনে জীবনের চরম সার্থকতা ঘটিবে।

*

... এইটুকু জেনো, প্রাণে-প্রাণে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। চোখের সামনে যা দেখছি, তাতে নিস্তব্ধ, নির্বাক, নিথর হয়ে যাচ্ছি। এ-সম্পদ সবার — এ যুগের সম্পদ। সবাই এ সম্পদের অধিকারী হবে। মহাভবিষ্যৎ আসন্ন — আমরা এক-একজন তারই এক-একটি আহুতি মাত্র। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা ভুলে যাও — উদার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখ — বিরাটের অভিযান। দেশ-

কালের সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে মহাপ্রাণের প্রাণ উন্মত্ত গর্জনে ছুটে চলছে — সচ্চিদানন্দের পানে — I feel it — it is drawing me irresistibly to that mighty abyss. Oh, the sweetness of death ! Oh, the Glory of sacrifice ! ভাই, এই কি চিত্ত আঁধার করে রাখবার সময় ? সম্মুখে দীপালি ! লক্ষ প্রাণের বর্তিকা জ্বালিয়ে তোল । তোমার প্রাণ-প্রদীপের শিখা জ্বলে উঠুক — অমনি দেখবে, অমন লক্ষ প্রদীপে মায়ের আরতি হচ্ছে — অনন্ত-রহস্যময়ী করালিণী মা আমার ! মরণ-পথিকের এই আহ্বান শুনে ছুটে এসো মরণের পথে — জীবনকে তীব্র দহনে নিঃশেষ কর — কালো, আলো হয়ে উঠুক ।

*

তুমি 'মুখ্য প্রাণ' সম্বন্ধ যাহা বলিয়াছ — তাহা ঠিক । আশ্চর্য এই, সেদিন আমার হৃদয়ে ঠিক এই তত্ত্বটিই স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল । আমি প্রাণকেই সত্য বলিয়া জানিয়াছি — সেই প্রাণের সন্ধানেই প্রাণ-পণ করিয়াছি । বোধ হয় জান না — ইতিমধ্যে আমি জ্বর-বিকারে মরণাপন্ন হইয়াছিলাম — এখনো শরীর অত্যন্ত দুর্বল । জ্বরের সময় অনেক বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি । মৃত্যুর করাল গহ্বর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জগৎটাকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি । এই জ্বরের পরে আমার এমন একটা অবস্থা আসে, যখন সবই আমার কাছে চিত্রের মত ভাসিতে থাকে — কিন্তু কি একটা বস্তুর অভাবে সব যেন ম্লান । সাংখ্য-বেদান্ত-পাতঞ্জল সব নিষ্প্রভ ! দুদিন ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন দপ্ করিয়া ভিতরটা জ্বলিয়া উঠিল, বুঝিলাম — সব আছে — প্রাণ নাই — তাই সব নিষ্প্রভ । জীবনের zest ওইটুকু — ওই প্রাণ ! হাঁ, ওই প্রাণ শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, অদীন-প্রাণে প্রাণবন্ত হইয়া যাহারা সত্যকে realise করে — তাদেরই হয় vital realisation ।

*

যিনি গিয়াছেন, তাঁহার স্থূলদেহকে আর পাইব না — কিন্তু মনের মাঝে তাঁহার স্মৃতি অমর হইয়া থাকুক । এবার ইন্দ্রিয় দিয়া নয়, ধ্যান দিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে । মহাসমুদ্রের বুকে একটি তরঙ্গ উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল — কিন্তু সমুদ্রের অস্তিত্ব অক্ষুন্নই রহিল । এখন সমুদ্রই সেই তরঙ্গের স্বরূপ । তোমার হৃদয়কে এই মহাসমুদ্রের ধ্যানে তন্ময় করিয়া দাও । বাহিরের তীব্রতম আঘাত অন্তরের উজ্জ্বলতম সত্যকে ফুটাইয়া তুলুক ।

সত্যস্বরূপ তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হোন্ ।

*

... বিষাদ-যোগে জীব জিজ্ঞাসু । জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে — মৃত্যুর সমস্যা । মৃত্যুকে পার হব কী করে, এই কথাটাই dramatic হয়ে দেখা দিয়েছে । ...

... তাঁকে জানতে হলে জগৎ-রহস্য জানতে হবে । সাতটি মহারহস্য আছে, অষ্টম অধ্যায়ে তারই বিবৃতি । বিশেষ করে জানতে হবে মৃত্যু-রহস্য । তার কথা খুব বিস্তার করেই বলা হয়েছে । মৃত্যু দীপ-নির্বাণ নয়, তাঁতে লয় । এইটি লক্ষ্য করতে হবে ।

*

এক শ্রেণীর ধীরেরা বলেন, সবার শেষে যা থাকে তা অবিদিত (তু. কেনোপনিষদ) অর্থাৎ মহাশূন্য । আরেক শ্রেণীর ধীরেরা বলেন, সবার শেষে আদিত্যদ্যুতি বা সম্যক্ প্রজ্ঞান । দুটি মতের 'অন্যদ্ভাব' বা বিরোধকে যাজ্ঞবল্ক্য মিটিয়ে দিয়ে বলেছেন, শূন্য এবং পূর্ণের আকাশ এবং সূর্যের সহবেদন চাই । মৃত্যুও শূন্যতা । তাকে অতিক্রম করা যায় একমাত্র পরমশূন্যতায় ঝাঁপ দিয়ে (সমস্ত কঠোপনিষদে এই বৈবস্বত-মৃত্যুরহস্য বিবৃত হয়েছে) । তখন সেই শূন্যেই ফোটে অমৃত । ব্যষ্টি-অনুভবের দিক দিয়ে শূন্যতার অনুভব অবিদ্যা, পূর্ণতার অনুভব বিদ্যা । আবার জগৎকারণের দিক দিয়ে তা-ই যথাক্রমে অসম্ভূতি এবং সম্ভূতি । এই ভাবনায় সমস্ত বিরোধের সমাধান ।

*

চরম অবস্থায় যে যায়, সে জীব, তার 'উৎক্রান্তি' হয় এবং সে ফিরে নাও আসতে পারে । বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশে যায়, আর ফিরে আসে না । কিন্তু সমুদ্র পরম-আশ্রয়, তার মধ্যে বুদ্বুদ ওঠাটা তো একটা নিতান্তই বাস্তব ব্যাপার —সেটা তো 'ইব' নয় ।

*

... বিষুবের সময়কার যে-পূর্ণিমা, আমরা এখন যাকে লক্ষ্মী-পূর্ণিমা বলি, তাকে কেন্দ্র করে তার আগের অমাবস্যায় হল মহালয়া আর পরের অমাবস্যায় দীপান্বিতা । তিনটি পক্ষ এল — পিতৃপক্ষ, দেবীপক্ষ, প্রেতপক্ষ । পিতৃপক্ষের শেষে মহালয়ার সাধনা অর্থাৎ মহামৃত্যুতে অবগাহন । এই সাধনা চন্ডীর রাত্রিসূক্তের অনুরূপ । মৃত্যুতে ঝাঁপ দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া অমৃতের কূলে — এইটি দেবীপক্ষের সাধনা, লক্ষ্মী-পূর্ণিমাতে তার পর্যবসান । কিন্তু তার পরেও আছে যথার্থ অদ্বৈতের সাধনা, যখন সিদ্ধচেতনা মৃত্যু এবং অমৃত দু'য়ের পর্যায়ের ওপারে চলে যায় । এই উত্তরণের প্রাচীন সংজ্ঞা ছিল ''প্রেতি'' বা লোকোত্তরে অবগাহন । তার জন্য আবার এক জ্যোতির্ময় অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া । সেই সাধনার শেষেই হল দীপান্বিতা — অব্যক্তের অন্ধকারে আত্মজ্যোতিকে অনন্ত আত্মদীপে পরিকীর্ণ দেখা । এই সিদ্ধপুরুষ তখন 'জিন' — শিবের মত তিনি মৃত্যুঞ্জয়, অথচ অমৃতেও লোভ নাই । এই হল 'গয়শীর্ষে' বিষ্ণুর তৃতীয়-পদে বা পরম-পদে আরোহণ, যেখানে দিনও নাই, রাতও নাই ; সৎ-ও নাই, অসৎ-ও নাই । গয়শীর্ষে এই বিষ্ণুপদের কথা যাস্কের নিরুক্তে আছে একটি প্রাচীন সম্প্রদায়-লব্ধ তত্ত্বরূপে — যা বৌদ্ধযুগের বহু আগে-

কার । লক্ষ্য করো, এখনও জৈনেরা ওই দীপান্বিতাকে মহাবীরের জন্মতিথিরূপে পালন করেন । এটাই সত্যকার মহালয়া বা মহাপরিনির্বাণ ।

*

প্রথম তাঁর সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান । তিনিই সব-কিছু হয়েছেন 'পুরুষ এব ইদং সর্বম্' । কিন্তু ইদং বলতে তো দেখছি ভূতগ্রামকে — শীর্ষ-অক্ষি-চরণ-বিশিষ্ট হাজার-হাজার পুরুষকে । বেদ বলছেন, এ তাঁকেই দেখছ — হাজার মাথা নিয়ে ভাবছেন, হাজার চোখ মেলে দেখছেন, হাজার পায়ে চলছেন — বিশ্বভুবন সব ছেয়ে আছেন ।

কিন্তু এতেই তিনি ফুরিয়ে যাননি । তিনি সবার প্রতিষ্ঠা, আবার সবাইকে ছাপিয়ে অতিষ্ঠাও । যা-কিছু হয়েছে (ভূত) সবই তিনি, আবার যা-কিছু হবে এ-সবাইকে ছাপিয়ে (ভব্য), তা-ও তিনি । যা হয়েছে তা মৃত্যুগ্রস্ত । কিন্তু তাদের মধ্যেও রয়েছে অমৃতের পিপাসা । সে-অমৃতত্বত্ত 'ভব্য' কিনা সিদ্ধ হবে । তবে হবে, তাঁর ঈশনায় কিনা আবেশে এবং শক্তি-সঞ্চরণে । আর হবেই-বা কেন, এ হয়ে চলেছে ।

কি করে ? দেখতে পাচ্ছি, আমরা সবাই অন্নের বশ । অন্ন খেয়ে বেঁচে আছি, অন্ন না থাকলেই মৃত্যু এসে গ্রাস করে । কিন্তু এরই মধ্যে যে চেতনার উন্মেষ হচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছ না ? দেখতে পাচ্ছ না, ওই অন্নকে আশ্রয় করেই সবার 'অতিরোহ' হচ্ছে, সবাই মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে উজিয়ে যাচ্ছে ?

এই পর্যন্ত সংহিতা মন্ত্র । তারপর দুটি মন্ত্রে তাদের বিবৃতি । ১৬ মন্ত্রটি ১৪ মন্ত্রের ব্যাখ্যা — অংশত । ঋষি বল্ছেন, দেখ, সর্বত্র তাঁরই পাণিপাদ অক্ষি শির মুখ এবং শ্রুতি । তিনি সব-কিছুই আবৃত জারিত করে রয়েছেন । তিনি ছাড়া আর কি আছে ?

এইটি ব্রহ্মদর্শনের প্রথম পাঠ । এই ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখছ, সে-দেখার বিষয়রূপে তাঁকে স্থাপন কর — ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপেই স্থাপন কর । বল, তিনি জীবে-জীবে, এমন-কি 'ওষধিষু বনস্পতিষু ।' তাঁকে দেখছি না, রামা-শ্যামা-যদু কাঠকুটা দেখছি — এ নয় । সবই তিনি ।

কিন্তু এ-দেখা পাকা হয় না, যদি ইন্দ্রিয়সংবিৎএর ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় সংবিৎকে আবিষ্কার করতে না পারি । বেদ তাই বলছেন, এই যে বিশ্বরূপ দর্শন, এ-ও তাঁর মায়া । বিশ্বরূপে তিনি নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন, অতএব এই বিশ্বরূপও 'বৃত্র'। তবে কিনা এই ত্বষ্টার বা জগৎশিল্পীর পুত্র বিশ্বরূপ । তাকেও বধ করতে হবে । বেদে আছে, ইন্দ্র এই ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপকে বধ করে তবে অমৃতকে পেয়েছিলেন ।

ইন্দ্রিয়ের অধিকার কতদূর পর্যন্ত — না, মন পর্যন্ত । তারও ঊর্ধ্বে বুদ্ধি । যদি তাঁকে বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়রূপে ধারণা করতে পার, তাহলে তিনিই সব হয়েছেন এ-জ্ঞান পাকা হবে । তাঁর অতিস্থিতির তত্ত্ব জানলে তবে প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব বুঝতে পারবে ।

অতএব তুমি ইন্দ্রিয়বর্জিত হয়ে তাঁর ধ্যান কর সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতরূপে ।

এ-ধ্যান হল আকাশের ধ্যান । ভূতাকাশ নয় — উপনিষদের হার্দাকাশ । হৃদয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য শূন্যতা, শুধু 'অস্তি ইতি উপলব্ধব্যঃ' — বিশুদ্ধ সত্তার বোধ । তিনি যখন সন্মাত্র, তখন তিনি সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত, অতএব অতিষ্ঠা, আকাশ হয়ে সব ছাপিয়ে আছেন । তাহলে এই জগৎ, এই বিশ্বরূপ? এই যে বললে, এ-ও তিনি ? তিনি যদি স্বয়ং অতীন্দ্রিয় হন, তাহলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ কার সৃষ্টি ?

তাঁরই সৃষ্টি । অতীন্দ্রিয় হয়েও তিনি ইন্দ্রিয়যুক্ত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়েছেন । তখন ইন্দ্রিয়ের যে-গুণ — আত্মার বাইরে অনাত্মীয় বস্তুর প্রতিক্ষেপ এবং তার গ্রহণ — তা তাঁর আ-ভাস কিনা প্রতিভাস (real appearance, কেননা তিনিই সব হয়েছেন) ওই অতীন্দ্রিয়ের মধ্যেই রয়েছে । যেমন আকাশ নামরূপবিবর্জিত হয়ে নাম-রূপের নির্বাহ করছে (ছান্দোগ্য) ।

তাইতে তিনি, 'অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' — হাত নাই তবু ধরছেন, পা নাই তবু চলছেন, চোখ নাই তবু দেখছেন, কান নাই তবু শুনছেন । ইন্দ্রিয় তাঁরই শক্তির প্রকাশ । তিনি তার বশীভূত নন, তিনি সবার প্রভু, সবার অমৃতত্বের ঈশান । আর তাঁর অমৃতস্বভাবের দিকেই যেন অন্নগতপ্রাণ মৃত্যুগ্রস্ত জীবের অতিরোহ । তখন তিনিই সবার শরণ । এককথায় তিনি বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম । কিন্তু হংসরূপে তোমার এই নবদ্বার ব্রহ্মপুরে অধিষ্ঠিত থেকে আগুনের শিখার মত লক্‌লক্‌ করে বাইরে প্রকাশ পাচ্ছেন ।

*

এখানে তো বিজয়া দশমীর পর পূর্ণিমা পর্যন্ত আলোর জয়ন্তী । কিন্তু তবুও এ-বিজয়া পূর্ণ নয় । অন্ধকারের সঙ্গে পাঞ্জার লড়াই এখনও বাকী । নচিকেতার মত একেবারে মৃত্যুর গহনে প্রবেশ করতে না পারলে মৃত্যুকে বৈবস্বত করে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় না । সেই মৃত্যুতে অবগাহনের সাধনা বা উপনিষদের ভাষায় বিনাশের সাধনাই হল রাত্রির রহস্য । এই রাত্রি প্রাকৃতদৃষ্টিতে বিনাশ, কিন্তু অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে তার গভীরে আছে অব্যক্তের আলো, কঠোপনিষদের ভাষায় অনালোকের আলো — 'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি' ।

আগামী কৃষ্ণা প্রতিপদ হতে এই রাত্রির সাধনা । পূর্ণিমার চাঁদ কলায়-কলায় ক্ষয় পাবে — এমনি করে চতুর্দশ কলা ক্ষীণ হলে পর তোমারও দশটি ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং চারটি অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রক্ষীণ হয়ে যাবে । তারপর অমার কুহরে অবগাহন করে কন্যাকুমারিকা রাত্রির দর্শন পাবে । সেই কালোর আলোতে অন্তর আলো হলেই জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন হতে মুক্ত হয়ে অমৃতত্ব লাভ সম্ভব ।

*

শ্বাস নিয়ে বাঁচি, শ্বাস ছেড়ে দিয়ে মরি । জীবন-মরণ তালে-তালে চলছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত । বাঁচি দেহে, মরি আকাশে । দুটাই একই প্রাণের ছন্দ । এই ভাবটি অধিগত করবার জন্য শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ । ওম্‌ সর্বব্যাপী একটা চিৎস্পন্দ । তাই যেন স্পন্দিত হচ্ছে শ্বাসে-প্রশ্বাসে এবং জীবন-মরণের ছন্দে । এই ছন্দ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্যই ওইরকম করে জপ করা ।

জীবনে বাঁচতে হবে নিঃসঙ্গ হয়ে — যেন আকাশে একমাত্র সূর্যের মত তুমিই আছ, তোমার চৈতন্যের আলোতেই বিশ্ব উদ্ভাসিত । এই বোধে সে আলোকে অনির্বাণ রাখতে হবে । তবেই শক্তি পাবে । তখন কর্তব্য হতে কিছুতেই পিছু হটতে পারবে না । আর কর্মশেষে একদিন আমার মতই নিঃসঙ্গ হয়ে মরতে হবে । ওঠ, জাগো ।

*

... তুমি যেন এজন্মেই তোমার পাত্র ভরে নিতে পার । কল্যাণাকাঙ্ক্ষা তাঁরই প্রসাদ — তার জরা-মৃত্যু নাই । তাকে চাইলেই স্বীকার করে নিলেই পাওয়া যায় । ...

*

আমার অবস্থা একই রকম । এ-দুর্বলতা হল যাকে বলে 'ওস্তাদের মার — শেষের মার ।' এ সারবার নয়, তার জন্য ভাবনাও নাই । জীবনের আলোয় মৃত্যুর আঁধারও আলো হয়ে ওঠে । তারপর আলো-কালো দুই-ই নিবে যায় । থাকে কেবল সর্বনাশের শান্তি । তাকে বেঁচে থাকতে-থাকতে আস্বাদন করাই বুদ্ধিমানের কাজ ।

*

মৃত্যুর চিন্তা করা খুব ভাল । ভয়ের সঙ্গে নয় — প্রশান্তির সঙ্গে । মৃত্যু ভয়ের কিছুই নয় । দেহের যে-সমস্ত যন্ত্রণাকে আমরা ভয় করি, মৃত্যুতে তো সেগুলি দূর হয়েই যায়, আর যাওয়ার আগে মনে হয় মৃত্যুই যেন মায়ের মতো কোল পেতে দিল, পদ্মহস্ত বুলিয়ে সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিল । মৃত্যুকে আকাশের মত একটা বিরাট প্রশান্তিরূপে ভাবনা করলে সেটা যদি ক্রমে জীবনের সঙ্গেও জড়িয়ে যায়, তখন বোধ হয় যে আমরা জোনাকীর আলোর মত ছোট একটা আলোকে আঁকড়ে ধরে এক মহাসূর্যের আলোর মধ্যেই বসে আছি — চোখ বুজে । যে-আলোকে ভয় করছি, তাকে বুঝতে চাইছি না ।

*

সংসারে আমরা আসি নিশ্চিন্ত হয়ে । যাবার সময়ও নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাওয়া উচিত । এখানে আঁকড়ে থাকবার কিছুই নাই, — সবাইকে ছেড়ে যেতেই হবে । তাই মৃত্যু-চিন্তায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত সবারই । যাতে যাবার সময় কিছু টান না থাকে — বেশ ঝাড়া হাত-পা নিয়ে চলে যেতে পারি । আজীবন মৃত্যু-চিন্তা করা খুবই ভাল । রবীন্দ্রনাথের একটি বড় সুন্দর কথা আছে —

'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে ।'

আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে আমি কিছু লিখিনি । জীবনের প্রস্তুতি — চলছে ভোর থেকে । এখন তো বেলা ঢলে পড়েছে । এখন কি মৃত্যু-চিন্তা করা উচিত নয় ? জীবন যেমন তাঁর ডান হাত, মৃত্যু তেমনি বাম হাত । এবার দু'হাত দিয়ে তাঁর দু'হাত ধরতে হবে না ?

*

জীবনে যা হয়, মরণেও ঠিক তাই হয় । জীবনের অধিকাংশ সময় যদি চঞ্চলতায় এবং বহির্মুখীনতায় কাটে, তাহলে যেমন দিনান্তে আমরা মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়ি, মরলেও তেমনি অন্ধতমে প্রবেশ করব । সূক্ষ্মশরীরের শক্তি তখন নিষ্ক্রিয় থাকবে, যেমন ঘুমে ইন্দ্রিয়শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে । কিন্তু জীবনটা যদি ভাবের ঘোরে কাটে, ইষ্টের সান্নিধ্যে ও সঙ্গলাভে কাটে, তাহলে ঘুমেও তার জের চলে — ইন্দ্রিয়শক্তি একেবারে লোপ পায় না, ভাব জ্যোতিতে বা দেবস্বপ্নে ফুটে ওঠে, মৃত্যুর পরেও তা-ই হয় । আরও গভীরে গেলে ভাবের মূলে শক্তির অর্থাৎ ভাবের উৎসের সাক্ষাৎকার হয়, তখন ঘুমের মধ্যে জাগে এক আনন্দ ও তন্ময়তা । এবং মৃত্যুর পরও ইষ্টের সঙ্গে আনন্দ-সম্মিলনের এক নিবিড় অনুভব । তার পরের অবস্থা হল তুরীয় । সাক্ষীভাবের প্রতিষ্ঠায় সেটি হয় ।

*

যখন চির-কিশোরকে হৃদয়ে ধ্যান করেন, তখন দেহ যেমন তেমনই থাকে, কিন্তু হৃদয় তাঁর ভাবাবেশে আপ্লুত হয়ে যায় । এই আবেশ তাঁরই আনন্দের আবেশ । তাকে ধরে থাকতে পারলেই দেহটি তাঁর মধ্যে তুলে ধরা হয় এবং অবশেষে সমুদ্রে বারি-বিন্দুর মত আমরা তাঁর মধ্যে মিশে যেতে পারি ।

*

তাঁর করুণা অবিরাম আপনার উপর ঝরে পড়ছে । আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না, দেহের কথা অত ভাববেন না ; একেবারে তাঁতে ডুবে যান ।

*

মহাজনেরা বলেন, সাত্ত্বিক-বিকারে দেহ চিন্ময় হয় । আটটি বিকারের পর নবম-বিকারে মূর্ছা — তাঁর সত্তা এসে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে । দশমী-দশা হল মৃত্যু । তখন মৃত্যুতে তাঁর মধ্যে অমৃত হয়ে জেগে উঠি ।

মৃত্যুভয় তখন লুপ্ত হয়ে যায় । তিনিই আমি, আমিই তিনি । এই অমৃতের পথেই আমরা চলেছি ।

মূর্ছার মতো অবস্থা হলে শরীরটা প্রথম-প্রথম খুব দুর্বল হয়ে পড়ে । তারপর তাঁর প্রসাদে সব আবার জ্বলে ওঠে ভিতরে অগ্নিশিখার মত । তাকেই বলে ‘বৈবস্বত-মৃত্যু’ । দেহের মৃত্যু ওইরকম বৈবস্বত-মৃত্যুর পথ খুলে দিলেই সব হয়ে গেল । তারপর আর কোনও বন্ধন থাকে না ।

*

সাত্ত্বিক-বিকারের ভিতর দিয়েই তিনি বারবার ধরা দেন । মূর্ছার ভাবটা শূন্যতাবোধের পূর্ব-অবস্থা । যাঁরা নিষ্ঠাভরে সাধনা করেন, একদিন মহাকাশের শূন্যতা এসে তাঁদের গ্রাস করেই । তাকে ভয় করতে নাই । ওই শূন্যতাই বৈবস্বত-মৃত্যুর পূর্বাভাস আনে । তখন মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পাই । শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে নিত্য, তা তখনই বুঝতে পারি । এখন সব ছেড়ে দিয়ে, সাধনার বাহুল্যের মধ্যে না গিয়ে তাঁর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ার সাধনা করে যান ।

*

এখন শাস্ত্রবাক্য নিয়ে চর্চা বা সাধন-সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিচার না করে কেবল গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম উপদেশ স্মরণ করুন । ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’ — সব ধর্ম ছেড়ে দিয়ে কেবল আমার (শরণ) নাও । এতে চিত্ত একতান হবে, আলোয় আর আনন্দে মন ভরে যাবে, তাঁর মধ্যে আমরা প্রবেশ করে তিনি-ময় হয়ে যাব । মৃত্যুভয় আর থাকবে না । এর চাইতে বড় সাধনা আর নাই ।

*

আমাদের উৎসবগুলি প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত বলে ওগুলি স্বচ্ছন্দেই সর্বজনীন হতে পারে ।... ধর, বাংলার এমন কি সর্বভারতীয় জাতীয় উৎসব শারদীয়া — মহালয়া হতে দেওয়ালি পর্যন্ত । এটা হল আসলে শারদীয় বিষুবের উৎসব — শরৎকালের সেই দিনটিকে কেন্দ্র করে, যখন দিনের আলো আর রাতের আঁধার সমান সমান । ওই দিনটি পড়ে আজকাল ২১শে । ২২শে সেপ্টেম্বর — ওই মোটামুটি ৭ই আশ্বিন ।

তোমার জীবনে আলো আর অন্ধকার সমান হয়ে গেল, এর নাম বিষুব । জীবনে অন্ধকারকে কি বাদ দেওয়া যায় ? কিন্তু আত্মশক্তিতে তাকে তোমার অন্তরে তুমি আলো করে তুলতে পার, আলোয়-কালোয় জীবনের একটি পরিপূর্ণ রূপ তুমি তোমার মধ্যে খুঁজে পেতে পার । তখন যে উৎসব তাই হল ওই শারদীয়া পূর্ণিমার কোজাগরী ।

শুরু হয়েছিল অনেক আগে । তিনমাস পিছিয়ে যাও — চলে যাও আষাঢ়ী পূর্ণিমায়, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে । তখন বছরের সব চাইতে বড় দিন । সারাদিন আলোয় কাটল, সারারাত চাঁদের হাসির বাঁধভাঙা প্লাবন । দিনে প্রজ্ঞার দীপ্তি, রাত্রে প্রেমের জ্যোছনা । বলবে না, এইখানে জীবনের পূর্ণতা ? এই তিথিকে সমস্ত ভারতবর্ষ আজও ধরে রেখেছে গুরুপূর্ণিমাতে, অম্বুবাচীতে,

বুদ্ধের ধর্মচক্র-প্রবর্তন-তিথিতে । দৃগগণিতের সঙ্গে ঐক্য না থাকায় একটু তিথির গোলমাল হয় । কিন্তু ভাবটি মোটামুটি ঠিক থাকে ।

তারপর থেকে দিন ছোট হতে থাকে । আলোর উপর জীবনের উপর মৃত্যুর কালোছায়া ঘনিয়ে আসে । একে বাইরে ঠেকাতে তুমি পার না, কিন্তু অন্তরে পার, তুমি যে মুক্তিশ্রী — আলো আর কালো দুই-ই তোমার কাছে সমান । তার সাধনা হল ওই শারদীয়া বিষুবের সাধনা । তবে আঁধারে ঝাঁপ দাও, অমাবস্যার গহন অন্ধকারকে খানখান করে দাও তোমার আত্মচৈতন্যের লক্ষ দীপের শিখায়-শিখায় । এর নাম দেওয়ালী । এ সবার সাধনা । বিশ্বজনীন সাধনা — হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সবার সাধনা । তুমি মহাবীর, তুমি জিন, তুমি মৃত্যুঞ্জয় — তার জন্যই ওই আলোর উৎসব অন্ধকারের বুকে । এ অনুভব বিশ্বমানবের । সেদিন আকাশে যে লক্ষ তারা ফোটে, সে কি মক্কায় বা জেরুজালেমে ফোটে না, কেবল ভারতবর্ষেই ফোটে ?

*

যিনি চলে যান, আমাদের মধ্যে তিনি অমর হয়ে বেঁচে থাকেন । মানুষ তখন দেবতায় রূপান্তিত হয় । ঋষি পরম পুরুষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি ।' সেই শাশ্বত পিতৃচৈতন্যের মধ্যে জেগে থাক । এছাড়া শোকে আর-কোনও সান্ত্বনা নাই ।

*

মৃত্যুকে তুমি সহজভাবে গ্রহণ করতে পেরেছ জেনে সুখী হলাম । মৃত্যু আমাদের নিতান্ত অপরিচিত নয় । প্রতিদিন সে আসে নিদ্রার আকারে । নিদ্রায় মনোলয় হয় । সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণলয় হলেই আমরা বলতাম মৃত্যু ।

চেতনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে নিদ্রা একটা বিশ্রাম । তখন চেতনা আকাশ হয়ে যায় — অবশ্য তমসাচ্ছন্ন আকাশ । মাঝে-মাঝে স্বপ্নের বিদ্যুৎ খেলে যায় তার মধ্যে ।

ইচ্ছা করে যদি নিদ্রাটা আনতে পারা যায়, তাহলে তাকে বলি সমাধি । চেতনা তখনও আকাশবৎ — কিন্তু তমসাচ্ছন্ন নয়, রৌদ্রালোকিত বা জ্যোৎস্নাহাসিত আকাশের মতো । তখন আমরা জেগে ঘুমাই । সাধারণ নিদ্রায় যেমন দেহ আর প্রাণের আরাম, এই সমাধিতে বা যোগনিদ্রায় তেমনি দেহ, প্রাণ আর মনের আরাম । আর ওই উজ্জ্বল আকাশটা বিজ্ঞানচেতনা ।

মৃত্যুর সত্যস্বরূপ হল ওই বিজ্ঞানচেতনা বা সৌরকরোজ্জ্বল আকাশ । তখন এই চৈতন্য ভাস্বর হয়ে ওঠে ওই মহাচৈতন্যে । যোগীর কাছে মৃত্যু তাই মহাসমাধি । আর অযোগীর পক্ষে মহানিদ্রা । কিন্তু উভয়ত্র তা জীবনের বিশ্রান্তি । আর এই বিশ্রাম সুখের আকারেই মৃত্যু — সারা জীবন ধরে বারবার আমাদের ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে । তাকে সত্যি সত্যি বলতে পার : 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান ।'

*

মৃত্যুর স্বপ্নে তোমার দেহ-চেতনা ছিল না অথচ অস্তিত্বের বোধ ছিল — এইটিই হল আসল কথা । দেহকে আমরা বস্তুপিন্ড ভাবতে অভ্যস্ত । পরের দেহটা তাই । কিন্তু আমার দেহটা আসলে দেহবোধ — দেহপিন্ডকে আশ্রয় করে । স্বপ্নে কিন্তু বোধটা লোপ পেয়ে যায় কিংবা আবছা থাকে । সুষুপ্তিতে থাকেই না । ধ্যান গভীর হলেও ঠিক তাই হয় । অথচ আত্মবোধ তখন উজ্জ্বল থাকে । দেহবোধ আর আত্মবোধ দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বুঝতেই পারছ । স্থূল দেহবোধ যত ফিকা হয়ে আসে (চলতি কথায় বলে ভাবাবেশে বিভোর হয়ে যাওয়া, আত্মহারা হওয়া) আত্মবোধ তত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ।

তখন স্থূল দেহবোধ রূপান্তরিত হয় সূক্ষ্ম দেহবোধে । এই দেহ ভাবময় । বৈষ্ণব বলেন, 'অন্তশ্চিন্তিত স্বাভীষ্ট দেহ' : অর্থাৎ মনের ভাবনায় নিজের ইচ্ছামত একটা দেহের বোধ গড়ে তোলা । ব্যাপারটা গোড়ায় নিছক কল্পনা — কিন্তু শেষে ওই কল্পনাই এত বাস্তব হয়ে ওঠে যে বস্তুর সত্তা ভাবের কাছে পান্‌সে হয়ে যায় । মরমীয়াদের এই অনুভব আক্‌সার হয় আর এর উপরেই পরলোক অমৃতত্ব ইত্যাদির ভিত্তি ।

*

জীবন-মরণের তফাতটা কি জীবনেই বোঝা যায় না ? বেঁচে আছি যতক্ষণ, ততক্ষণ জীবনটা বাস্তব, আর মরণটা কল্পনা । কিন্তু জীবনটাই কি নিরেট বাস্তব, তাতে কল্পনার ভেজাল নাই ? আর মরণটা কি একেবারেই কল্পনা ? সে কি ঘুমের মতো, সমাধির মতো বাস্তবও নয় খানিকটা ? আসল কথা, চৈতন্যের পটে সাদা-কালোর ভেদটাই কৃত্রিম । সাদাটাও খানিক কালো, কালোটাও খানিক সাদা । তাইতে বোধহয় শেষ পর্যন্ত কবির এই কথাই সত্য — 'জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন, প্রাণ পাই যেন মরণে ।' যাজ্ঞবল্ক্যও ঠিক এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন ।

*

জ্ঞান বা প্রেম দুয়েরই আধার হল ওই আকাশ । এটুকু না বুঝলে সাধনায় ফাঁকি আর সিদ্ধিতে ফাঁক থেকে যায় । আকাশ বরুণ, তা-ও আবার অনালোক আকাশ । আকাশ শিব, আকাশ মৃত্যু । মৃত্যু সর্ব-নিষেধের আধার । নেতির পশ্চাৎপর্বে এক অনির্বচনীয় ইতি, যা নেতির দোসর । অস্তিত্বের বর্ণরতিতে আমরা এমনই প্রমুদিত যে ওই আকাশকে কেবলই এড়িয়ে যেতে চাই । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এসে আমাদের গ্রাস করেই । তখনকার অবর্ণনীয় অস্তিত্বের একটা ঝলক আর তার পরেই মহাপরিনির্বাণ — বোধ হয় জীবের এই নিয়তি । যেন সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদের ভেঙে পড়া । সমুদ্র হবার আগে এক-লহমার জন্য সে বুঝতে পারে সমুদ্র কী — তার পর যে কী হয়, তা আর 'Zান্‌তি' পারে না । কিন্তু যদি ফিরে আসে, তখন তার রেশ থাকে । তখন বলতেই হয়, 'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান ।' তিল-তিল করে অস্তিত্বের ক্ষয় করা, এ যে কী কঠিন, তা বলবার নয় । কিছুতেই বুঝতে চাই না, আমি না থাকলেও সব থাকে । এবং তার পরেও আরেকটা কথা, ওই অবর্ণের ভূমিকায় ফুটতে থাকে একটা অপরূপ বর্ণরাগ — যা বস্তুতই

Supramental । কবির বয়ান উলটে দিয়ে বাস্তবিকই বলা চলে — 'মন বোঝে না, প্রাণ বুঝেছে ।' আর সে-বোঝায় কী আরাম ! সেই আরামের ভূমিকায় আবার নতুন করে মনের আনন্দ-লীলায়ন । তারপর সবার শেষে যে সমৃদ্ধ শান্তি, তাই অমৃত । অর্থাৎ মৃত্যু, ওই আকাশ । তখনই সত্যকার 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগঃ' — যার পরিচয় প্রেমবৈচিত্ত্যে । তারপর কী আছে, কেউ বলতে পারে না ।

*

ঋক্‌সংহিতায় দেখি, মৃত্যুর পর সবাই দৃশ্যমান বিশ্বের রূপ পরিগ্রহ করে — একথাটা খুব স্পষ্ট । মৃতের চক্ষু সূর্যে যায়, আত্মা বাতাস হয়ে যায়, তনু ওষধি-বনস্পতি হয় — ইত্যাদি কথা যাম্যসূক্তে আছে । এটা ঠিক বুদ্বুদের সমুদ্রজলে মিশে যাওয়ার মত অবস্থা নয় । যাঁরা চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদী, দেবতাকে সাদা চোখে দেখেন রূপে-রূপে প্রতিরূপ, তাঁরা মৃত্যুর পর যে বিশ্বরূপ হবেন, এ-প্রত্যয় খুব সহজেই আসতে পারে । এই প্রত্যয় অনুসরণ করে কৃষ্ণরূপ জীব গীতায় নিজেকে বিশ্বরূপ বলে অর্জুনের সামনে প্রকট করতে পারেন । আমার এই শরীরেই তুমি কৃৎস্ন জগৎকে দেখো — কৃষ্ণের এই উক্তি যোগীর একটা আন্তর অনুভবের বাস্তব অভিব্যক্তি বলে ধরা যেতে পারে ।

কিন্তু গীতাতে আরেকটা কথা আছে । ব্রহ্মলোক হতে পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ভগবৎ-ধামে গেলে তা হয় না — একথা সেখানে পাই । এই মতবাদে ব্রহ্মভাব আর ব্রহ্মা হওয়াতে সুস্পষ্ট ভেদ সূচিত হচ্ছে । বৌদ্ধেরাও রূপাবচর ভূমির শেষ-পর্বকে বলতেন আভাস্বর ব্রহ্মলোক । এটি বৈদিক মরণোত্তর বিশ্বরূপতার প্রতি কটাক্ষ ।

কথাটা আরও সোজা করে বলা যায়, আমরা 'জীবো অসুঃ' সূর্য হতে এসেছি, সুতরাং মরলে পর আবার তাতেই ফিরে যাব, অথবা আমাদের সাধনার এই হল পরম সিদ্ধি, এটা বলাই যথেষ্ট নয় । সূর্যের পরেও আকাশ আছে । আকাশ হওয়া অথবা অসৎ-ব্রহ্ম হওয়াই পরমার্থ । এই থেকে সূর্যদ্বার-ভেদের কল্পনা এসেছে । এ-প্রকল্পের মূল সংহিতাতেই পাওয়া যায় ।

*

প্রেম জীবন, জ্ঞান মরণ । যতদিন বেঁচে আছি, প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতেই হবে — নাকে-মুখে নোনাজল ঢুকলেও । নুলিয়াদের তাতেই আনন্দ । কিন্তু ব্যাপারটা ঘটছে মৃত্যুর পটভূমিকায় । কালো ছেলেকে গোপীরা ভালবাসল । ওই 'নীলং পরঃ কৃষ্ণং' যে কী সাংঘাতিক জিনিস, তা কি তারা জানত না ? নীল সমুদ্র নাকি মহাপ্রভুকেও গ্রাস করেছিল ।

জ্ঞান মরণ । মরণের কোনো রং নাই । সব রং সে কখনও শুষে নেয়, তখন তাকে শিবের মত ধবধবে সাদা মনে হয় — যেন হিম-শীতল বরফের চাঙড় । আবার কখনও সে সব রং উগরে দেয়, তখন সে ওই 'নীলং পরঃ কৃষ্ণং' আকাশ । এখন একই মৃত্যুর শোষণ আর

উদ্‌গিরণ থেকে মনে হচ্ছে নাকি যে জ্ঞানের মধ্যে জীবন আর মরণ দুয়েরই স্থান আছে — পর্যায়-ক্রমে নয়, সেটা মনের কল্পনা — আছে যুগপৎ ?

জীবনে-মরণে, জ্ঞানে-প্রেমে, বিনাশে-সম্ভূতিতে, কৃষ্ণ-রাধার নিত্য-সামরস্য । কিন্তু মন তা বুঝবে কী করে ? তাই সে কখনও ঝোঁকে মরণের দিকে, কখনও জীবনের দিকে । জ্ঞানের দিক থেকে গীতায় এর একটা ফয়সালা করা হয়েছে । প্রথমটায় বলা হয়েছে জ্ঞানের কথা — ব্রাহ্মী-স্থিতির কথা । এটা অবশ্যই নিদ্রায় বা সমাধিতে নয় — স্রেফ দু'চোখ মেলে ব্রাহ্মী-স্থিতি । কিন্তু তখনই আবার 'অভিতো ব্রহ্মনির্বাণম্'-এর আস্বাদন চলতে থাকে । সে-আস্বাদন যে কী চিজ্, তা গীতায় ভেঙে বলা হয়নি । ওটা হচ্ছে জীবনের বুকে বসে তারই মধ্যে মরণের অনির্বচনীয় মধুর রসের আস্বাদন ।

আস্বাদন চলল 'এই জীবনে', কিন্তু এ-জীবন তো একদিন ফুরিয়ে যাবেই । তখন কী হবে ? গীতাকার অম্লানবদনে বললেন, তখন 'অন্তকালে চ ব্রহ্মনির্বাণম্' । ব্যস্, জীবলীলার এইখানে খতম । জ্ঞানী হোন আর ভক্ত হোন, ওই ব্রহ্মনির্বাণের হাত থেকে কারও রেহাই নাই ।

জীবলীলা শেষ হয়, কিন্তু শিবলীলা তো ফুরায় না । সব রং যে শুষে নিল, তার হৃদয়ের অতলে আবার রং-এর ছয়লাপ । সেই রং অবর্ণ আকাশে রামধনু হয়ে উপ্‌চে পড়ে । জীব তখন কোথায় থাকে ? বলা শক্ত । আপাতদৃষ্টিতে ফুরিয়ে যায় ।

তাহলে শিবকে ভালোবাসার ওই যে মাতামাতি, তার কী গতি হবে ?

আমি বলি, শিবই যদি জীব হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর একটা নিত্য-জীবত্বের ভূমিকা আছে । আর সেই ভূমিকা অন্তত একটি মুহূর্তের জন্য জীবে সংক্রামিত হয়, যখন সে কৃষ্ণসাগরে ডুবে মরে । মরবার পূর্ব-মুহূর্তে দিব্যজীবনের একটা আশ্চর্য চমক — সেই সুফী সাধকের মতো, যিনি শিরশ্ছেদের মুহূর্তে কল্‌মা পূর্ণ করে বললেন, 'হাঁ ইল্লালাহা — তুমি আছো, মরে বুঝছি, তুমি আছো, জীবন ভরে ছিলে, এখনও আছো, পরেও থাকবে ।'

এটা যে অন্তিম মুহূর্তেই ঘটে, তা নয় । ওই অন্তিম মুহূর্ত বারবার আসে । 'We lovers die many times before our death.' আর প্রত্যেকবার নিত্য-জীবত্বের আস্বাদনে অর্থাৎ তিনি কোন কল্যাণগুণে আমি হয়েছেন তার আস্বাদনে ''বিদিতাত্মা'' হই — নিজেকে জানি ব্রহ্মনির্বাণের ভিতর দিয়ে ।

কিন্তু দোহাই, তা বলে ওই ব্রহ্মনির্বাণকেই 'চরম' বলে রায় দিও না । বল, ব্রাহ্মী-স্থিতি আর ব্রহ্মনির্বাণে যেখানে গলাগলি, আমি সেই অগমলোকের বাসিন্দা । ভব-নির্বাণে কোনো ভেদ নাই ।

*

আমার শরীরের অবস্থা একই রকম । ঝুলনের সুর লেগেছে এখন জীবনে ।

'মরণ দোলায় ধরি রশিগাছি
বসেছি দুজনে বড় কাছাকাছি
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া

মারিবে ঠেলা —
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে
ঝুলন খেলা
নিশীথবেলা ।

দে দোল্ দোল্ ।
দে দোল্ দোল্ ।'

জীবনের শেষে যা পরম লাভ, তা হল প্রজ্ঞা আর প্রেম । দুটিতে একটি অনাদি-মিথুন । সেই যুগলের আনন্দ তোমাদের নন্দিত রাখুক ।

বাইরে কোনও উন্নতি দেখতে পাচ্ছি না — তার জন্য আমার মাথাব্যাথাও নাই । নদী সমুদ্রে পড়বার আগে মন্থর আর বিশাল হয়ে যায় । তারপর চিরকৈশোরের জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মহাসমুদ্রে চৈতন্যের অবগাহন, এই জীবের নিয়তি ।

আকাশের সঙ্গে সমুদ্রের মিলন, যেমন পুরুষ আর প্রকৃতির মিলন, আকাশ আর তুষারপর্বতের মিলনও তা-ই । সমুদ্র প্রকৃতির হৃদয়, আকাশের স্তব্ধ মহিমার দিয়ে চেয়ে-চেয়ে প্রেমে উদ্বেল, আর তুষার-পর্বতে সে সেই মহিমাতেই সমাহিত শান্ত শুভ্র যোগিনী । একটিতে তার প্রেমের, আরেকটিতে প্রজ্ঞার প্রকাশ । দুই-ই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' এর উপাসনা ।

আনন্দই জীবনের আদি-মধ্য এবং অন্ত । দুঃখ যেন সমুদ্রের বুকে একটা সাময়িক আন্দোলন, তা-ও আনন্দেরই সুরে গাঁথা ।

শরীরটা বিছানায় পড়ে আছে, কিন্তু মনটা তো নাই । সে তোমাদের প্রতি সেই একভাবেই আছে, যখন শরীরটা সচল ছিল । জীবনের আসল লক্ষ্য হল, তাঁকে হৃদয়ভরে পাওয়া । তোমরা পরস্পরের মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা ও আনন্দকে অখন্ডরূপে উপলব্ধি করলেই আমি ধন্য ।

*

চিরকাল আমি জীবনরসিক — প্রাণের পূজারী ; মরবার চেষ্টা অনেকবার করেও মরতে পারিনি । কিন্তু মরণের পেয়ালায় এই যে জীবনের সুরায় চুমুক দেওয়া — এ তো মহেশ্বরেরই বিলাস, নইলে করোটি তাঁর পানপাত্র কেন ?

নটরাজের তান্ডবে যে যুগল-চরণক্ষেপ, — তার একটি সৃষ্টি, আর একটি প্রলয় ; দুটিই অনন্তের সুরে বাঁধা । মানুষ তাকে ভাবে প্রলয়তান্ডব । আমি জীবনরসিক ; বলি এ তাঁর সৃজনতান্ডব । তাঁর প্রতি পদক্ষেপে 'মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে-ঝলকে ।' মরণকের কোলে বারবার তাই জীবনকেই দেখি — মহেশ্বরের কোলে উমার মত । কিন্তু একথা ঠিক জানি, হোক্ জীবন, হোক্ মরণ — আসক্তি কারও রস নয় । জীবনে আর মরণে বাজছে অস্তিত্বেরই মহাছন্দ — যা উৎসারিত হয়েছে পরমব্যোম হতে, মহাশূন্যের সুনীল রহস্য হতে ।

*

জগতের কোনও ঘটনাই নিরর্থক নয় — সবার গতি এক মহৎ লক্ষ্যের পানে । মহামানবের মৃত্যু যেভাবেই হোক, তা-ও অমৃতবর্ষী হয় — একথা ধ্রুব-নিশ্চিত । মৃত্যুতে শোক করো না — কাজ করে যাও ; দেহ মরবেই, কিন্তু ভাব তো অবিনশ্বর । গান্ধীর মতই দেশকে ভালবাস, তবেই তাঁর আত্মার তর্পণ হবে ।

*

...মৃত্যু তো ভয়ের কিছু নয় । আর মানুষ মরলেই কি ভূত হয়ে তোমার ঘাড় মটকে দিতে আসবে ! বরং তার জন্য প্রার্থনা করো, সে যেন আনন্দলোকে আনন্দময়ের সঙ্গে এক হয়ে যায় । সে যেখান থেকে এসেছিল, সেইখানেই আবার ফিরে গেছে । আমরাও যাব । ভয় পাবার কি আছে ?

যখনই তার কথা মনে পড়বে, ইষ্টমন্ত্র জপ করো তাকে ভেবে ।

*

আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না । সংসারে কেউ চিরকাল থাকে না । আমার যাবার সময় এসেছে, আমি তার জন্য প্রস্তুত । চলে গেলেও আমি তোমাদের মধ্যে থাকব — কেন না আমরা সবাই তাঁর মধ্যেই আছি । জীবনে-মরণে তাঁকে পাওয়াই আমাদের পরমার্থ ।

*

জীবনের প্রতি মমতা থাকাই স্বাভাবিক । কিন্তু এত করেও তো জীবনকে কেউ ধরে রাখতে পারে না । ভাবে মরে গিয়ে আবার কোথাও বাঁচব । কিন্তু আমার বুদ্ধি বলে, তার কি নিশ্চয়তা আছে ? যখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি, তখন কোথায় যাই ? ফুঁ দিয়ে আলোটা নিবিয়ে দিই, তখন কোথায় সে যায় ?

মহাশূন্যতাই সবার পরিণাম । বুদ্ধদেব তাই বলেছিলেন, নির্বাণই সত্য । নিবে গেলে আর-কিছুই থাকে না । আত্মা ভগবান সবই তোমার মনের কল্পনা । এ-ভাবনার একটা লাভ আছে । প্রথমত, কঠিন সত্যকে স্বীকার করবার সাহস থেকে মন নির্মোহ হয় । তারপর ওই শূন্যতাকে যদি চেতনায় বহন করতে পারি, চেতনার ঐশ্বর্য বাড়ে, যদিও তার পরিণাম শূন্যতাই ।

... ফুল ফুটছে । ফুটল তো, এটুকুই লাভ ।

*

আকাশ কথা বলে না, আলো কথা বলে না — নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ে । ফুল ফোটবার সময় কোনও শব্দ হয়না । হওয়াটাই যে নিঃশব্দ । মাতৃগর্ভে ভ্রূণ নিঃশব্দ । আবার মৃত্যুও নিঃশব্দ । জীবনের দুটি প্রান্ত নিঃশব্দ আকাশে ছাওয়া ।

*

খোঁজাটা প্রথম পর্ব । তারপর শুধু তলিয়ে যাওয়া । মাঝে-মাঝে ঘুমিয়ে পড়তে পার বলেই অপরূপা হয়ে জেগে ওঠ । জান, ঘুম আর মৃত্যু দুইই কী সুন্দর । আমি এক বৃদ্ধাকে চোখের সামনে মরতে দেখেছিলাম, বছর-দুই আগে । তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কিছু অদ্ভুত ছিল । ৭৫ বছর বয়স, কিন্তু কোনদিন আমার সামনে আসতেন না, আমার নাম মুখে আনতেন না, ছেলে-মেয়েদের কাছে উল্লেখ করতেন 'তিনি' বলে । কদাচ কখনও সামনে পড়ে গেছেন যদি লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতেন । ছেলে-মেয়েরা তা-ই নিয়ে তাঁকে tease করত । মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁর লজ্জা ঘুচে গেল । শেষ জলটুকু আমার হাত থেকেই খেয়ে যেন আরামে চোখ বুঝলেন । দু'ঘন্টা পরে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম । এক অনুপমা পঞ্চদশী কিশোরী যেন অসীমের বুকে ঘুমিয়ে আছে । মৃত্যুই প্রেমের দয়িত, তাই না ?

মৃত্যুর গভীরে অবগাহন কর, জীবন কমলের মত ফুটে উঠবে ।

*

প্রতিদিন নিজের গভীরে ডুবে গিয়ে আকাশকে আবিষ্কার করো । তাতে স্নাত পূত হয়ে দিনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো । আবার দিনের শেষে তলিয়ে যেও সেই আকাশের মাঝে । এমনি করে জীবন-মরণের ছন্দেই দোলা — সত্যি এ অফুরান হতে পারে । মাঝে-মাঝে আকাশের মাঝে, মৃত্যুর মাঝে ডুব দেওয়া, সেই তো অমৃত ।

*

এত খুশীর আয়োজন চারিদিকে । তার মধ্যে কি ভাবছি, জান ? 'জন্মদিন মৃত্যুদিন দোঁহে মুখোমুখি' । আর কল্পনা নয়, অবশ্যম্ভাবী অতিবাস্তব । তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও তো সেদিন হয়ে গেল । আজ চামেলীর মত সে-ও যদি বলে, 'আসবো কি ?' আমিও বলব, 'এসো এসো বঁধু, এসো আধ-আঁচরে বসো, নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি ।' মনে হচ্ছে জীবনের এই তো পরিপূর্ণ সম্ভোগ — মৃত্যুর 'উপসেচন' বা চাটনী দিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে তাকে ভোগ করা । কথাটা যমের (কঠোপনিষদে) । তোমার অদিতি কিন্তু তা-ই গো — একাধারে জীবন আর মরণ ।

*

এক অনিঃশেষ প্রতীক্ষা নিয়ে জেগে থাকা — বুদ্বুদ সমুদ্রে মিশবেই । সেইখানে জীবনের সার্থকতা, যতদিন বেঁচে আছি, তা সুরভি হয়ে থাকবে তোমাদের নির্মল হৃদয়ের অকুণ্ঠ ভালবাসায় । সেই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ।

*

...আমি বলেছিলাম এই মনে করে, 'স্তব্ধতার শেষ নাই' । আমরা যত ডুবি, তত পাই — অথবা তত হই । Star of Bethlehem বলে একটা ফুল আছে cactus জাতের, নিশ্চয় জান । সে ফুটতে শুরু করে সন্ধ্যাবেলায় । রাত্রের আঁধার যত গভীর হয়, ততই তার হৃদয়ের দল মেলে । অবশেষে ঠিক মধ্যরাত্রের নিঃসুপ্তিতে সে তার হৃদয়কে পূর্ণ বিকশিত করে দাঁড়ায় 'আঁধার ঘরের রাজা'র সামনে । একটি মুহূর্তের পূর্ণতা, তারপর তো আর-কিছুই বাকী থাকে না । শুরু হয় দল ঝরানোর পালা । ভোর এগিয়ে আসে, Star of Bethlehem এর পরম সার্থকতার রহস্য আকাশে মিলিয়ে যায় । সূর্যোদয় হয়, তারাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না । শুকতারাকে মরতে দেখনি আলোর মাঝে ? সেই আলোর মরণই তো দিব্যজীবন ।

আমি তোমাকে মরণের অথৈ জলেই ঝাঁপ দিতে বলেছিলাম । তবেই না জীবন সহস্রদল মহিমায় ফুটে উঠবে ।

সহস্রদলই বটে । কিন্তু তবুও তার মূল ওই মরণের অতলে ।

সৃষ্টির এই রহস্য । অনেকখানি ফাঁকার মাঝে একটি তারার চুমকি । এ না হলে কি মানাত ?

*

শরীরের অবস্থার বিশেষ-কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা জানি না । ওকে শিউলীর মত ভোরের আলোয় প্রস্ফুটিত হৃদয়ের সুবাস নিয়ে ঝরতে দেওয়াই ভাল — রোদে ঝলসে আঁধারে কুঁকড়ে মরার চেয়ে । তাইতে আমরা 'অমর হয়ে রব মরি' — তুমি, আমি, সবাই । তাই না ?

যত দিন যাচ্ছে, ভিতরটা যেন জ্যোৎস্নার তারে সুরের ঝঙ্কারের মত কাঁপছে । কিসের কাঁপন ? সহজের — যার আরেক নাম ভালবাসা, 'ভালবাসি, ভালবাসি' — এই কথাটিই 'জলে স্থলে বাজার বাঁশী ।'

*

মাঝে-মাঝে হঠাৎ সব-কিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে নিও — যেন তুমি কোথাও নাই । যেন আকাশে মিলিয়ে গেছ । সংসারকে ভালবাসা যেমন জীবনের সাধনা, তেমনি এমনি করে শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া হল মরণের সাধনা । ভগবান জীবন-মরণ দুইই পূর্ণ করে আছেন ।

*

২রা নভেম্বর, ১৯৭৪

শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বিজর ও বিমৃত্যু অবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই দেহকে অজর এবং অমর করা যায়, তার ইঙ্গিত সেখানে আছে। পতঞ্জলি আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন ধাপগুলির ব্যাখ্যা করে। এই অমরত্বের পথে একটা ধাপ আছে যাতে প্রাতিভসংবিৎ ঘটে, যাতে অনেক-কিছু দেখা বা বোঝা যায়। তন্ত্র ওই ধাপগুলির কঙ্কাল এখনও ভূতশুদ্ধির মন্ত্রে ধরে রেখেছে।

আমরা অমর লোক দেখিনি, অশ্বত্থামা, হনুমান ইত্যাদির কথা শুনেছি মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ চেষ্টা করেছিলেন এই দেহে অমরত্ব নামিয়ে আনতে। শ্রীমাও চেষ্টা করেছিলেন। অনেকটা এগিয়েও ছিলেন। ৯৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন।

আমিও চেষ্টা করেছিলাম কিছুটা, কিন্তু পারব বলে মনে হয় না।

এটা কিন্তু সম্ভব। একটা hypothesis ধরে এগোতে হয়। সেই এগনোর সময় দেখা যায় যে, তার অনেকগুলি ধাপই পর-পর মিলে যাচ্ছে। সুতরাং তার চরম বা শেষ ধাপটিও তো না-মিলবার কথা নয়। যদি চরমটা অসত্য হত, তবে তার পথেও তো গোলমাল দেখা দিত, কিন্তু সে গোলমাল নাই।

আমি নিজে দু'তিন জন বৃদ্ধকে দেখেছি, যাঁরা ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেছিলেন। এই ইচ্ছামৃত্যুটা তো অমরত্বের এক ধাপ নীচে এবং কম বড় কথা নয়।

আমি যখন আলমোড়ায় ছিলাম তখন নিজেই অনুরূপ দু'একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও পরে শুনেছিলাম যে সেখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনুরূপ ঘটনার বহু উদাহরণ পাওয়া যেত। সেখানে তখনকার লোকেরা তাকে বড় একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলে মনে করত না। আমি যাঁদের দেখেছি তাঁরা সনাতন ধর্মপন্থী পুরুষ ছিলেন, ডাক্তারি ওষুধবিষুধ বা কলের যানবাহনের মোটেই তোয়াক্কা করতেন না।

আমরা ওই অমরত্বের পথে এগোতে পারি না বা শেষ সীমায় পৌঁছতে পারি না কেন ?

তার অনেক বাধা। পুরাতন ভারতবর্ষ অনেকটা এগিয়ে ছিল, যেমনটি আমি দু'চারজনের ইচ্ছামৃত্যুর ঘটনার কথা তোমাকে বললাম। ওই অমরত্বের সাধনার পথে একটা অখন্ড ধারা চাই — যা কয়েকটা generation এর পর generation পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলবে।

আমরা প্রাচীন ভারতীয় মহান ঐতিহ্যের সূত্রটি হারিয়ে ফেলেছি এবং যে একাগ্রতা নিয়ে এই কঠিনতম পথে এগোতে হয় তা আমাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণেও বর্তমানে নেই। বর্তমান সময়ে সেভাবে চলারও নানা অসুবিধা আছে। এই অমরত্বের সাধনা বোধ হয় অতীত ও অনাগত সর্বকালের মানুষের সবচেয়ে বড় সাধনা।

তুমিও চেষ্টা করে দেখো ওই উপনিষদ ও পতঞ্জলি-নির্দিষ্ট পথে। অমরত্ব যদি নাই-বা পেলে ওই প্রাতিভসংবিৎ ইত্যাদির যে ঐশ্বর্য লাভ করবে, তা জীবনের পরম সম্পদ — সন্দেহ নাই। এখনও বহু মানুষ আছেন, যাঁরা ওই ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। তবে তাঁরা তো আর বাজারে বেরোন না। লেখেনও না, বক্তৃতাও দেন না। জীবনের পরম প্রিয় জিনিষ নিয়ে আত্মারামে মগ্ন, বাইরের লোকের কাছে প্রায়ই ধরা দেন না।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫

কেমন আছি ? কখনো উত্থান, কখনো পতন, আবার কখনো মরণ ।

মৃত্যুটা কী ? এই তো শুয়ে আছি । যখন আমার ইন্দ্রিয়াদি আর কাজ করবে না, আমি নড়ব না, চড়ব না, সাড়া দেব না — তখনই তো আমি মরব ।

এই মৃত্যু তো একটা স্বাভাবিক ঘটনা । এতে এত ভীত হওয়ার কী আছে ?

মৃত্যু তো আলোর পুত্র — যার জন্য উপনিষদে যমকে বলা হয়েছে বৈবস্বত অর্থাৎ সূর্যের পুত্র । সূর্য মানে আলো । উপনিষদে আরও বলা হয়েছে — যম সব-কিছু পাশবদ্ধ করে অর্থাৎ বেঁধে রাখেন । মৃত্যুর ঠিক-ঠিক মুখোমুখি হতে জানলে আর মৃত্যুভয় থাকে না । মৃত্যুর এক পিঠ উজ্জ্বল আলোয় আলোময় ; আর-এক পিঠ অন্ধকার । মৃত্যুর অন্ধকার-পিঠ উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তো তার উজ্জ্বল রূপটি দেখতে পাওয়া যায় ।

তিত্তির পাখি (যা থেকে তৈত্তিরীয় উপনিষদ) নাকি বড় সুস্বাদু । সে মানুষের খুব পোষও মানে । তাকে যা দাও, সে সমান আস্বাদে খেয়ে নেবে । তার কাছে ভালো-মন্দ নাই ।

আমার একটি নেপালী ভৃত্য ছিল আলমোড়াতে । তার নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল সুগভীর । পাঁচ-মিনিট দেরী হয়েছিল, তাই সে কাজে এল না । তাকে আমি দুপুরে খেতে দিতাম । সে রোজ খেত আর জিজ্ঞাসা করলে বলত — বাবু, মিঠা লাগতা । এমন-কি যেদিন ব্যঞ্জন খুব খারাপ হয়েছে, সেদিনও ।

জীবন ও মৃত্যুতে এইরকম সমভাব হওয়া চাই । শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, ‘‘আমি দেখছি সব-কিছু অখন্ড চৈতন্য — আনন্দসত্তায় জরে রয়েছে । গলার ঘা-টিও তারই একপাশে পড়ে ।’’ ক্যানসারের রসে তিনি ঈশ্বর-রস অনুভব করছেন । ভয়ানক ব্যাধিও বাধা হয়ে ওঠেনি ।

ভক্তের প্রশ্ন — মৃত্যু সত্য ঠিক কথা, কিন্তু যে-সত্যকে আশ্রয় করে মৃত্যু সত্য, সেই সত্যকে পাওয়ার জন্যই তো আমরা মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে চাই । তিনি যেমন মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি ভক্তের আবেদন শোনাও তো তাঁর ব্যবস্থার মধ্যে ?

হ্যাঁ, দুটো ইচ্ছা অর্থাৎ তাঁর এবং ভক্তের — এক হলে হতে পারে ।

দেখ, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানকে অনুভব করা যায় এবং ইন্দ্রিয়ের চরম সার্থকতা তাতেই । পতঞ্জলি তাকেই প্রাতিভসংবিৎ বলেছেন । এই চক্ষু নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা ভগবানকে দেখা যায়, ভগবানের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, ভগবানকে আস্বাদন করা যায়, ভগবানের বংশীধ্বনি (নাম) শোনা যায়, ভগবানকে স্পর্শ করা যায় । কে একজন বলেছেন, maximisation of senses-এর মধ্যে মনুষ্যত্বের চরম উৎকর্ষ ।

*

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

তোমার মায়ের শোকে কাতর হয়ো না । মৃত্যুই অমৃতের দ্বার । যাঁরা পুণ্যচরিত, মৃত্যুর পর তাঁদের উৎক্রান্তি হয় । তাঁরা দেবযানের পথ ধরে উজিয়ে চলেন এবং অবশেষে তাঁদের আত্মজ্যোতি পরমাত্ম-জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় । এখন তোমার চিন্ময়ী মা-কে সেইরূপেই ভাবনা কর — জগন্মাতার সঙ্গে এক করে ।

তোমার মা যেভাবে চলে গেছেন, তাকে বলে বৈবস্বত-মৃত্যু — স্বর্ণ-জ্যোতির্ময় লোকে উত্তরণ । কথায় আছে, 'জপ-তপ কর কি, মরতে জানা চাই ।'

তোমার মা তাই-ই দেখিয়ে দিয়ে গেলেন । কী অপূর্ব কথা বলেছেন — 'ঘরের আলোটা নিভিয়ে দে, বাইরের আলো আসতে দে, দেখি ।' Withdrawal from within — শান্তভাবে মিলিয়ে গেলেন, যেমন দিনের আলো সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায় । কাউকে ডাকাডাকি না করে ; কোনো পার্থিব পিছুটান না রেখে । নিজের কাজ নিজে করতে-করতে চলে গেলেন, নিঃশব্দে সকলের অলক্ষ্যে ।

ম্যাক্সম্যূলার সাহেব ভারতীয় জীবনধারার এই দিকটিতে খুব আকৃষ্ট হয়ে বলেছিলেন — ''ভারতীয়রা কীভাবে মরতে হয় তা ঠিকঠিক জানে ।'' আর যারা মরতে জানে, তারা ঠিকঠিক বাঁচতেও জানে ।

তোমার মা বেছে নিলেন — সূর্যের উত্তরায়ণ, ঊষার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত । হরি ওঁ বৈদিক মহানাম । জপলগ্ন মন শান্ত, যন্ত্রণাহীন নিরুদ্বেগ নিরপেক্ষ নিঃশব্দ উৎক্রান্তি ।

মৃত্যুই অমৃতের দ্বার । এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি অমৃতলোকে বিরাটের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন, চিতাগ্নিকে আশ্রয় করে আবর্তনশীল ভূর্ভুবঃস্বঃ — এই তিন-লোককে অতিক্রম করে । তুমি তাঁর ভাগ্যবান সন্তান । সন্তানের মধ্যে তাঁর গুণ আরও স্ফুটতর হয় — এটা স্বাভাবিক ।

প্রাচীন ভারতে আর্যরা মহনীয় মরণের জন্য সাধনা করতেন । আলমোড়ায় থাকা-কালে আমি নিজে তা প্রত্যক্ষ করেছি ।

আলমোড়ার ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইচ্ছামৃত্যু-ব্যাপারটা পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বেও যেন স্বাভাবিক ছিল । কখন কীভাবে মরবেন — তাঁরা নিজেরা ঠিক করে নিতেন । এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং এক ব্যক্তির বৃদ্ধা মাতার কথা জেনেছিলাম ।

ব্রাহ্মণটি নিরালায় সাতদিন আগে চলে গেলেন । অনুগমন করতে নিষেধ করে গেলেন । পরে গিয়ে স্বজনেরা দেখেন দেহ একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা এবং শিখাটি তখনও সম্মুখস্থ হোমাগ্নিতে জ্বলছে । ব্রাহ্মণ মহাসমাধিতে লীন হয়ে গেছেন ।

আর বৃদ্ধা সন্তানদের বললেন, আমাকে নদীতীরে নিয়ে চল । ডাক্তার ডাকতে নিষেধ করলেন । ইঞ্জেকশন ফোঁড়াফুড়ি — কিছু না । পা' দুটি জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে বললেন এবং তাঁকে ঘিরে সংকীর্তন করতে বললেন । তার পর দেহ ছেড়ে চলে গেলেন দিব্যলোকে ।

আমাদের ভিতরে অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পুরুষরূপে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি একটি দীপশিখার মতো — যাঁকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন psychic being — তাঁরই নির্দেশে এইসব ঘটে । ব্যক্তির ইচ্ছায় হয় না ।

ব্রহ্মগ্রন্থিতে নাড়ীর যোগ । জৈবভাব বর্তমান থাকলে মানুষ প্রাকৃত-অবস্থাতেই থাকে । বিষ্ণুগ্রন্থিতে মানুষের জৈবভাব থেকে উত্তরণ ঘটে । তখন প্রাকৃত-ভাব থেকে সে যেন অনেকটা আলাদা হয়ে পড়ে । আর রুদ্রগ্রন্থি হল আমাদের ভ্রূ-মধ্যস্থান । সেখান থেকে আলোর ছটা বিকীর্ণ হচ্ছে উপরে নীচে চতুর্দিকে — শিবের ডমরুর মতো । রুদ্রগ্রন্থির পরে ওই অঙ্গুষ্ঠমাত্র-পুরুষ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে উৎক্রান্ত হন এবং স্ব-স্বরূপে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন ।

মা কোনো অপরাধ নেন না । তুমি যদি শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া না-ও করতে, তাতে কিছু হতো না । করেছ, বেশ করেছ, তোমার মনের দিক থেকে ঠিক থাকলে ।

*

মার্চ, ১৯৭৬

জয় বা ধর্ম কী, মৃত্যুই বা কী, জীবনই বা কী ? এর উত্তর হল — জয়, ধর্ম বা জীবন হল থেমে-না-যাওয়া । থেমে-যাওয়া মানেই পরাজয়, মৃত্যু বা অধর্ম । Outwardly থেমে-যাওয়া হতে পারে । কিন্তু সর্বদাই অন্য একটা পথ খুলে যায় । গতিকে সেই-পথ দিয়ে প্রবাহিত করতে হয় । আমি পরাস্ত হয়েও পরাস্ত হই না, মন দিয়ে কখনও পরাজয়কে মেনে নিই না, যদিও বাইরের কারণে হয়তো আমাকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে । মন দিয়ে যদি পরাজয়কে মেনে না থাকি, তবে আমার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে, আজ হোক, কাল হোক বা পরেই হোক, আবার আমি উঠে দাঁড়াব এই দেহে বা অন্য দেহে, এইভাবে বা অন্যভাবে । থেমে যাবে কেন ? চলবে । জগৎ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ চলাটাই সত্য ; থেমে যাওয়া মিথ্যা । তার পর জগদ্-বোধ যখন বিলুপ্ত হয়, তখন চললাম, না থেমে রইলাম, সে-প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে ।

এগিয়ে যাও । এ-পথ দিয়ে হোক বা অন্য পথ দিকে হোক । থেমে যেও না । থেমে যাওয়াই মৃত্যু — এটাই মৃত্যুর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা । থামবে কেন ? চলতে থাক ।

*

১৪ মে, ১৯৭৭

নচিকেতা যমকে মোক্ষম প্রশ্ন করলেন — ‘‘বল, মৃত্যুর পর আমি থাকি, না, থাকি না ?’’ আমার আপাত-অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় । কিন্তু পরম অস্তিত্ব থেকে যায়, তা কখনই বিনষ্ট হয় না, হতে পারে না এবং তাই-ই হল অমৃত ।

হাসিমুখে মরতে পারাই সবচেয়ে বড় বাহাদুরী। দাঁতের বা মুখের হাসি নয়। একেবারে অন্তরের হাসি এবং সেইজন্য মানুষকে বলা হয়েছে — অমৃতের পুত্র। তুমি যদি পার মরার মতো মরতে, তবেই তোমার অমরত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

একটি রাস্তার কুকুর-ছানা নিতান্ত অবহেলায় ড্রেনের পাশে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছিল। আমি তার মুখে একটু জল দিতে গেলাম। মনে হয়েছিল, সে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওই ড্রেনের দিকে যাচ্ছিল। পারল না জলটা খেতে, তার আগেই প্রাণত্যাগ করল। সে বুঝল না, একটি মানুষ তার জন্য জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখ, দুটা ব্যাপার আছে — জ্ঞাতসারে মরা, আর অজ্ঞাতসারে মরা। জ্ঞাতসারে নির্ভয়ে পরমেশ্বরের মৃত্যুময় রূপকে প্রেমালিঙ্গন করার ঢং-এ মরতে পারাই সাধনার পরাকাষ্ঠা। মরে সবাই, কিন্তু এইরকম মৃত্যুর মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতত্ব লুকিয়ে থাকে। আমি যে মরিনি, আমি যে বেঁচে আছি এবং চিরকাল অনবচ্ছিন্নভাবে এমনটিই থাকব — এটি হল অমরত্বের একটি বড় লক্ষণ।

*

১৮ জুন, ১৯৭৭

দেহের ধর্ম অনুসারে মৃত্যু আসবেই। আজ বা কাল, বা দশ-বিশ বছর পরে হোক। কিন্তু এই দেহের মধ্য দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার সাধনা করতে হবে। মৃত্যুকে জয় করা মানে নিজের সর্বব্যাপিত্বে অবিচলিত প্রত্যয়। দেহের মধ্যে আমি আছি যেমন সত্য, দেহ ছাড়িয়েও আমি আছি, এটাও সত্য।

আমার চেতনার যেমন-যেমন উত্তরণ ঘটে, তেমন-তেমন আমরা আমাদের দেহাতীত অস্তিত্বের খবর পাই। দেহাতীত সত্তার লীলা-আস্বাদন যখন সহজ-সরল আয়াসহীন এবং প্রলম্বিত হয়, তখন আর এই দেহ-কুঠুরীতে থাকতে তেমন ভাল লাগে না। যেমন কলকাতার বদ্ধ আবহাওয়ায় থাকতে আমার কোনো দিন ভাল লাগত না। দেবতারা যখন মর্ত্যে আসেন, শোনা যায় তাঁরা নাকি ভীষণ কষ্ট পান এই দম-বন্ধ-হওয়া মর্ত্যলোকের পরিবেশে। মনের সাহায্যে তুমি তোমার সেই সর্বব্যাপিত্বের আস্বাদন করতে পার — তাই সেটিকে বলে মনোময় সত্তা। এর উপরে হল প্রজ্ঞা— সেটি মনেরও ঊর্ধ্বে জ্যোতির্ময় লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিস্থ-অবস্থা — দেশকালাতীত অবস্থা — time and space সেখানে absent। তখন কোনো একটা ছোটো-খাটো বাসনা — যেমন, জল খাব ইত্যাদি ধরে তবে তিনি মর্ত্যে নেমে আসতে পারতেন।

*

২০ অগাষ্ট, ১৯৭৭

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর আগে একদিন অন্তরঙ্গদের ডেকে বললেন — দেখ, আমার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধবাসরে যেন এই গানটি গাওয়া হয় — 'সমুখে শান্তি পারাবার।'

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমতী জো-কে একটি চিঠিতে লেখেন — দেখ, আমি এমন প্রগাঢ় শান্তিতে আছি — যে শান্তি নিথর, নিস্তব্ধ, সুন্দরতম ও মধুরতম — যা থেকে একটুও নড়তে ইচ্ছা করছে না। তোমাদের আশীর্বাদ বা অভিনন্দন জানাব — সে-জন্যও নয়।

হ্যাঁ, এই শান্তিই হল শেষ কথা। এই জিনিস পেলে আর-কিছু চাওয়া বা পাওয়ার থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটার অর্থ আমি পূর্বে বুঝতে পারিনি। কিন্তু পরে বুঝলাম, সত্যিই তো অনন্ত শান্তির পারাবারে পাড়ি জমাবার থেকে জীবনে আর কী ঈপ্সিততর থাকতে পারে!

*

২১ জানুয়ারী, ১৯৭৮

মানুষের অন্তিম বাঁচা-মরা মস্তিষ্কের গভীরতম বিন্দুর স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত। ভ্রূণাবস্থায় দেহাকৃতি লাভ করবার পূর্ব থেকে এই স্পন্দন আরম্ভ হয়, heart বন্ধ হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর পর্যন্তও এই স্পন্দনটি চালু থাকে। এই স্পন্দনটি দেহ থেকে নির্গত হয়ে গেলে তবেই সম্পূর্ণরূপে প্রাণত্যাগ হয়েছে বলা যায়। ওই স্পন্দনটি সূক্ষ্মতম এবং অবিনাশী। বায়ু-নির্ভর বিন্দু-নির্ভর হয়ে ওই স্পন্দনটি চলতে পারে। ব্যক্তির মৃত্যুতে ওই স্পন্দনটি মরে না, ওই দেহেতে আর অধিষ্ঠিত না থেকে কাজ করে না — এই পর্যন্ত। স্বরূপে লীন হয় অথবা দেহান্তর গ্রহণ করে, অথবা সেইকাল পর্যন্ত আকাশে-বাতাসে অবস্থান করে। ওটি মহাপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণেরও প্রাণ।

এইটিই দেহস্থ অনির্বাণ শিখা। এটি জ্বলছে, তাই দেহ আলোকিতময়, কর্মময়। ওই শিখাটি কখনও নিভে যায় না, উত্তরণ ঘটে মাত্র। অর্থাৎ যেভাবে যেখানে জ্বলছিল, ঠিক সেইভাবে সেইখানে জ্বলে না বটে, তবে সত্তা যেন নিজের তাগিদে ওই শিখাটিকে নিয়ে অন্যত্র চলে যান — যেমন একটি জীর্ণ ঘরে মানুষ বেশী দিন থাকতে পারে না, অপর একটি ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সত্তার দৈহিক স্তর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দেহাতীত এক অবস্থায় ওই শিখাটি জ্বলতে থাকে।

দেখ, এই দেহটার অমরত্ব দিয়ে কী হবে? দেহটা যে-যে উপাদানে গঠিত হয়েছে, তাদের সেখানে ফিরে যেতেই হবে — এটি প্রকৃতির নিয়ম। একে কেউ রুখতে পারে না এবং রোখা বাঞ্ছনীয়ও নয়। আমার দেহটা যখন মরে যাবে, তখন তা লক্ষ-লক্ষ কীটের খাদ্য হবে। আমি ওই-সকল কীটগুলির মধ্য দিয়ে বাঁচি না? সাধু-মহাপুরুষদের দেহও দু'তিন-দিনের মধ্যেই decomposed হতে শুরু করে। সুতরাং দৈহিক অমরত্ব বা অবিনশ্বরতার পিছনে ছুটে লাভ কী?

এর মধ্য দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করাই জীবন ও মরণের সার্থকতা। যদি তাঁকে পেলাম, তবে জীবন সার্থক। যদি তাঁকে না পেলাম, তবে হাজার-মরণেও কোনো সার্থকতা নাই। এটাই মনুষ্য-জীবনের সব থেকে বড় অলৌকিকত্ব, ম্যাজিকের মধ্যে অলৌকিকত্ব কিছুই নাই।

*

৬ মে, ১৯৭৮
শেষ দর্শন

কে বলল, আমার জীবনটা শুধু আমারই ? এই দেহের মধ্যে আছি বলেই কি জীবনটা এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির হয়ে গেল ? তা নয়। আমি যেমন এই দেহের ভিতরে আছি, তেমনি আমি সর্বদেহে বিরাজ করছি। আমার জীবনটা বিশ্বময় ছড়ানো। আমি তোমার মধ্যে আছি, তার মধ্যে আছি ; কেঁচোর মধ্যে আছি, সাপের মধ্যে আছি। বাইরের খোলটা শুধু আলাদা-আলাদা ; ভিতরটা সর্বত্র এক। যখন ব্যক্তির চেতনা এই স্তরে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই ব্যক্তিজীবনের লোপ ঘটে এবং বিশ্বজীবন, Life Universal-এর বিকাশ ঘটে। তখন এই দেহটা থাকলেই-বা কি, গেলেই-বা কি ? আমি তো রয়েইছি। সুতরাং আমার মৃত্যু কীভাবে সম্ভব ? আমি তখন অমৃতত্ব লাভ করি।

*

জীবনের সূচনা হয়েছিল অনাদি-মিথুনের ভালবাসায়, তার পুষ্টিও হল ভালবাসায়। জীবন যখন বৈবস্বত-মৃত্যুতে সার্থকতা লাভ করল, তখন তার সম্মুখে যে শান্তির পারাবার ভেসে উঠল, তাতে সহস্রদল লাবণ্যচ্ছটা নিয়ে বিকশিত হল এই ভালবাসারই আনন্দ-শতদল। তন্ত্রে তার নাম হল ষোড়শী শ্রী — বেদের ষোড়শকল সোম্যপুরুষের সঙ্গে নিত্যসক্ত কন্যা-কুমারিকা। দুটিতে মিলে অদিতি-বরুণের দেবতাদ্বন্দ্ব।

*

আমি বৈবস্বত-মৃত্যুতে ডুবব সেই রসের তিমিরে।

*

বলতে পারি, জীবন্মৃত্যুই জীবন্মুক্তি। বাউলের ভাষায়, ও হল জ্যান্তে মরা হয়ে থাকা।

আমি যে বেঁচে আছি, তার লক্ষণ হচ্ছে — আমায় নাড়া দিলে আমি সাড়া দিই।

কিন্তু এই সাড়াতে আবার সুখ-দুঃখের রং লাগে, আর তাইতে শুরু হয় ছট্‌ফটানি। চাই নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কিন্তু দ্বৈতের জগতে সেটি হবার জো নাই।

কবির ভাষায়, 'ওঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল হাসি ক্রন্দনে ভরিয়া' । এটা নাকি নটরাজের বিশ্বনৃত্য ।

তাঁর নৃত্যের আনন্দ, কিন্তু এদিকে আমাদের প্রাণ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ে ।

আমরা তখন মরণ চাই । সত্যি তখন মনে হয়, 'যজ্জীবনং তন্মরণং যন্মরণং স মম বিশ্রামঃ ।'

কিন্তু নটরাজের নৃত্যে সব আনন্দ হয়ে ওঠে কি করে ? কোন্ মন্ত্রে জীবনসমুদ্র-মন্থনের হলাহল তাঁর কণ্ঠে ইন্দ্রনীলের শোভা হয়ে ফুটে ওঠে ?

জীবনে তিনি শব । তাঁর বুকের উপর চলছে কালীর নৃত্য । কিন্তু তিনি তিতিক্ষার পরম সিদ্ধিতে নির্বিকার । এই তার জীবন-মৃত্যু — কালী তখন তাঁর 'হৃদয়াম্বুজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জুষা' । এ কালী দক্ষিণকালিকারূপে বিপরীত-রতাতুরা হলেও তাঁর ক্ষোভ নাই, আছে আনন্দ ।

সেই আনন্দের ছন্দোময় অভিব্যক্তি — যখন তিনি নটরাজ হয়ে নাচেন কালীর কঙ্কণের তালে-তালে ।

*

জীবন যতদিন না মৃত্যুর অভিষেকে অমৃত হয়ে ওঠে, ততদিন বিবেকীর কাছে তা দুর্বহ । অথচ এই অমোঘ নির্মম সত্য মোহের আবরণে ঢাকা পড়ে যায় । দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল ছাপিয়ে বিরামবিহীন ওঙ্কারধ্বনি আর শোনা যায় না ।

বিয়ের সময় সানাই বাজে । তার মধ্যে 'রাধা আমার মান করেছে'-টাই আমাদের মন ভোলায় । তার পিছনে যে পোঁ ধরে আছে, তাকে শুনেও শুনিনা ।

জীবনবেদের সার ওই ওঙ্কারধ্বনিতে । কেবল একটা সুরই বাজুক হৃদয়ের একতারাতে : 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা, অন্য কোনওখানে ।'

এখানকার ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছুটি চাওয়া নয় । ভূমার আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে অল্পকে ছেড়ে যাওয়া : 'ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ — ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি ।'

এই মন দিয়েই ভূমাকে পাওয়া, ওর চারদিককার দেওয়াল ভেঙে দেওয়া । যা-কিছু দভ্র, তা-ই বৃহৎ হ'ক — মনের বিস্ফারণে । আত্মার আভিজাত্য ফুটে উঠুক স্বারাজ্যে — যা রাজ্য-বৈরাজ্য-সাম্রাজ্যকেও ছাপিয়ে ।

আমার মধ্যে আমাকে যেদিন খুঁজে পাব, সেদিন বাইরের আকাশ নেমে আসবে 'অন্তর্হৃদি' । সেখানে যে-আকাশ, তা 'জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ'; আর তার আধার তোমার-আমার সম্মিলিত হৃদয়ের 'দহরং পুন্ডরীকং বেশ্মতে' — যেখানে মরণের কোলে জীবনের নিত্যবাসর পাতা ।

*

জীবনের ছ্যাকড়া-গাড়িতে চেপে কোথায় চলেছি জানি না । আমার কি কোনও ভবিষ্যৎ আছে ? থাকলে সে কিম্ভূত-কিমাকার তা বলতে পার ? যদি পার, তাহলে সে আর ভবিষ্যৎ রইল না — বর্তমান হয়ে গেল, তোমার এই মুহূর্তের চিত্তবৃত্তিতে ধরা দিল ।

এই চিত্তবৃত্তিকে রুদ্ধ করে একটা অশ্বডিম্ব লাভ করবার জন্য অত ধস্তাধস্তি করা কেন ? সে তো আপনা-হতেই একসময় আসে নিদ্রাতে অথবা মৃত্যুতে । নিদ্রা আর মৃত্যুর শূন্যতা জীবনের পিছনে ওৎ পেতে বসে আছে । তাকে এড়াবার চেষ্টা করছ কেন ? 'স্বস্তীত্যুক্ত্বা' তার মধ্যে প্রবেশ করছ না কেন ?

ওই মহানাস্তিই সত্যকার অস্তি । জীবনের আদিতে মধ্যে অন্তে আছে একটা শূন্যতা — এইটাই অস্তিত্বের মর্মসত্য । দুটি অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্তমধ্য যে-পর্ব, তার গায়ে সুখ-দুঃখের বিচিত্র বর্ণের যে-সমাহার, তাকে একনজরে দেখতে পারি যদি, তাহলেই সে জীবনের মোজেয়িক হয়ে ফুটে ওঠে । তখন তাকে দেখে রসিকের চিত্ত রস পায় ।

এ-রস জীবনের অতিরেক । জীবনের মোহকে ছাড়িয়ে উঠতে পারলেই তার সাক্ষাৎ মেলে মৃত্যুর মাধুরীতে ।

মৃত্যু ভয়াল নয়, করাল নয় । 'যজ্জীবনং তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ ।' অতএব 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ।।

*

... সত্যি এ-স্থূল দেহটা একটা যন্ত্রণা । কিন্তু একে ছাড়বারও তো উপায় নাই । জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের একেবারে গাঁটছড়া বাঁধা । চৈতন্য থাকলেই কোনও-না-কোনও রকমের দেহ থাকবে — এই মর্ত্যশরীর থেকে শুরু করে আকাশ-শরীর পর্যন্ত ।

আকাশ-শরীরটাই সত্যকার শরীর । বিশরণের ধর্ম তার মধ্যে এত ক্ষীণ যে অশরীরের সঙ্গে তার তফাত বলতে গেলে নাই ।

আমি আকাশ, অদিতি, আর তুমি আমার শরীর । ও-শরীর আলোর শরীর — আকাশ হ'তে আলোতে আর আলো হ'তে আকাশে চলাচলের কোথাও বাধা নাই । আর তাইতে নিবিড় সম্পরিষঙ্গে উথলে ওঠে যুগনদ্ধ চেতনার সামরস্য ।

*

আজ রবিবাসরীয় সেই মামুলী ত্র্যহস্পর্শ । ... সপ্তাহের আদি বার এই রবিবার — আর সেই উপলক্ষ্যে একটু আয়েস, একটু খানাপিনার বরাদ্দ করি । কিন্তু সেটা কখনও সর্বজনীন হয় না — কারও হয়তো পৌষমাস, কারও সর্বনাশ । বাবুরা রবিবারটা গড়িয়ে কাটান, ঝি-চাকরের ব্যবস্থা থাকলে গিন্নীরাও তাই করেন । কিন্তু ঝি-চাকরের ছুটি নাই — এক সেই রাত-দুপুরের পর ছাড়া । তাও পুরুষগুলির যদি ছুটি থাকে তো মেয়েগুলির নাই, তাদের ছানাপোনা আছে, হেঁসেলের কর্তব্য আছে ... কোথাও একটু পরিচ্ছন্নতা নাই, ফুরসৎ নাই — এক ঘুমে ঢলে-পড়া আর মৃত্যুতে জীবনের দেনা চুকিয়ে দেওয়া ছাড়া ।

অথচ এই জীবনকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য মানুষের কি আঁকুপাঁকু । আসলে 'যজ্জীবনং তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ' — একথা ক'জন বোঝে ।

যদি বুঝত, তাহলে জীবন জুড়ে এই যে ব্রহ্ম আর ক্ষত্রের ওদন রেঁধে তা গলাধঃকরণের নেশায় মানুষ এত মশগুল, তার আসল উপসেচন যে মৃত্যুতে — তা বুঝে ওই মৃত্যুর সাধনাকেই জীবনের সার বলে বুঝত । আর তাইতে libido কে ছাপিয়ে মাথা চাড়া দিত death wish.

*

আজ রবিবাসরীয় ত্র্যহস্পর্শ । বৈদ্যনাথ, পত্রলেখা আর অভ্যাগতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে । করব । একটুখানি মেঘের ছোপ-লাগা নীলাকাশের মুখে হাসি ফুটেছে । ক'দিন ধরে বিকালে কালবোশেখীর নকিব এসে বলে যাচ্ছে, 'এই উনি এলেন বলে ।' তাই বসন্তের আমেজটা এখনও আছে ।

ভাবছিলাম, মানুষের দুর্মর জিজীবিষার কথা । ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত আলোর অব্যাহত উত্তরণ । জল-ঝড় যতই হোক-না-কেন, তবু সবিতার দীপ্তি অনির্বাণ । দুপুরের সবিতা পশ্চিমের দিকে হেলে পড়েন, কিন্তু সাবিত্রী বলেন, 'যেতে নাহি দিব' । হায়, তবু যেতে দিতে হয় ।

অথচ যাওয়া হয় না । জীবনের উল্লাস থিতিয়ে আসছে, তবু মানুষের জিজীবিষা বলছে, উপশমকে আমি মানি না, আমি 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' ।

তা বটে । কিন্তু এই দেহে নয় । জরা-মৃত্যুকে তার কাজ করতে দিতেই হবে । তবে কিনা দেহ বুড়িয়ে মরলেও মন বুড়ো হয় না বা মরে না । ভিতরে-ভিতরে মন আরেকটা মনের মতন দেহ গড়ে তোলে, বলে এ-দেহ মরুক-না-কেন — ভূতশুদ্ধির দ্বারা আমি মনোময় পুরুষের একটা আবসথ গড়ব ।

চলে মনুপুত্রের অবিশ্রান্ত সাধনা । গড়ে ওঠে অন্নময় পুরুষেরই উদ্বর্তনে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় পুরুষ । এই পুরুষই হয়ে ওঠে স্বানুভবসংবেদ্য ব্রহ্মপুরুষ, যিনি 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' ।।

*

মনটা মরবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে । বৈবস্বত-মৃত্যুর জন্য হাতছানি আড়াল থেকে : 'তুমি চলে এস আমার কাছে ।'

আমি আসব কেন, কালিন্দী — এই দেখ, আমি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছি আকাশের পানে হাত বাড়িয়ে । তুমি এসে ধরা দাও, আমার বাহু-বন্ধনে, উষশী — শিশিরের মত ঝরে পড়ুক আমার দেহ-প্রাণ-মন জুড়িয়ে দিয়ে তোমার জ্যোৎস্না-শীতল ভালবাসার মাধুরী ।

কিছুই করবার নাই, দেখবারও নাই । কর্তৃত্ব গেল, দ্রষ্টৃত্ব গেল — রইল শুধু ভোক্তৃত্ব । জীবন-মরণ দুইই যে অমৃত হয়ে উঠেছে, হৈমবতী — রসের তিমিরে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধ সব ডুবে গেল । রইল শুধু একাগ্র-চেতনার 'কৈলাস-শিখরে রম্যে' অতিচ্ছন্দা শরীরের দিব্যসম্প্রয়োগে সামরস্যের মধু-নির্ঝরণ ।

তিত্তিরি, সারা জীবন তুমি ভাল-মন্দ তাজা-পচা সব খুঁটে খেলে, বললে 'মিঠা লাগতা হৈ ।' বললে, 'রসো বৈ সঃ' ; তার গভীরে পেলে রসার অতল জল ।

অদিতি, আমি রস, তুমি আমার রসা ।।

*

আজ রবিবাসরীয় ত্রিবেণী-সংগম : বৈদ্যনাথ আসবেন, পত্রলেখা এসেই আছে — তার নটেগাছটি এখনও মুড়োয় নি । অভ্যাগতেরা কাল হৈহৈ করে গেলেন বিনা আমন্ত্রণে, আজ তো আমার দানসত্র খোলাই আছে । বায়ুশূল তো আছেনই, আর কে থাকবে জানি না ।

তবে আকাশে আজ মেঘ নাই । ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভেসে আসছে কালকের অপরাহ্নের স্মৃতি — কৃষ্ণপ্রিয়ার মধুর হাসি ।

সবই তুমি সতী, তোমার পরণে যে দ্রৌপদীর শাড়ী — যত টানাটানি করি-না-কেন তোমার অবসনা অনগ্না মাধুরী দেখবার জন্য, ততই তার বাহার যেন আর ফুরায় না ।

শান্ত হয়ে টানাটানি ছেড়ে দিয়েছি, খানিকটা শ্রান্ত হয়েও বটে । 'পারিনা ভাসিতে মূরতির স্রোতে ।' ইন্দ্রিয়পথে বিচিত্র শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে ধরা দিচ্ছ অহরহ, অথচ আমার মনে তৃপ্তি নাই ।

অধরাকে ধরার এই আকিঞ্চনের অর্থ বুঝিনা । কেন 'গুণে মন ভোর' থাকা সত্ত্বেও 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে', কেন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর' ?

দিনের কোলাহলেই এই অফুরান কান্না । অবশেষে নিষুতি-রাতে সে শুধু সুখস্বপ্নের কোলে একটি আবছা অশ্রুলেখা ।

জীবনের সব কোলাহলের অবসান মৃত্যুর অমৃতে ।।

*

মহাজনের উক্তি : 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে' — তা-ই যদি হয় তাহলে যাজ্ঞবল্ক্যের এই অনুশাসনই জীবনের পরম দিশারী : 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ।

অর্থাৎ জীবনে-মরণে গাঁটছড়া বাঁধা হলেই জীবনকে তারিয়ে-তারিয়ে সম্ভোগ করা যায় । বিরহ আর মিলন দুই-ই সমান সত্য — পরিণামে দেখি, মিলনের চাইতে বিরহে রসের আস্বাদন গভীরতর ।

তাই লক্ষ্মীকে হারিয়েই নিমাই তাকে আরও গভীর করে পেল দিব্যোন্মাদে ।

*

শুধু এইটুকুই মানি, জীবনের শেষ হলেই অশেষ শান্তি । সেই শান্তিতেই বৈবস্বত-মৃত্যুর মার্মিক অনুভব । পাশহস্ত মৃত্যুর অত্যাচারটা তার পাশেপাশে সমানে চলবে — নিস্তার নাই ।

তাই জীবন আর মরণে, সুখ আর দুঃখে, আলো আর আঁধারে চিরকাল জোটবাঁধা থাকবেই । এই 'দুই সতীনের পিরীত হলে তবে শ্যামা-মাকে পাবি ।'

সে-শ্যামা কেমন ? আকাশের নীলে তার প্রকাশ, না পৃথিবীর বাসন্তী সবুজে ?

বোধহয় দুই-ই যুগপৎ সত্য । সব হিরণ্যবক্ষা অদিতির খেলা ।

'সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে —
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধাসরসে ।'

আজ রামনবমীর শেষে বিজয়া-দশমীর দিনে, সর্বাণী, তোমার পরমব্যোমস্থ হিরণ্যবক্ষের সবুজে সুনীলে অভিষিক্ত হয়ে বলি, মৃত্যুই অমৃত ।

*

আড়াল থেকে উঁকি দেয় ভাগবতী সত্ত্বতনু । 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' পরম-পুরুষের সত্ত্বতনু । আমি মানুষ, আমার মর্ত্যতনু জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কবলিত হবেই — যদি আমি ভাবনার আশ্রয় না নিই । ভাবনা হচ্ছে বৈদিক কল্পনা — যে-কল্পনা একটা অচরিতার্থ বাস্তবের হাতছানি নয় শুধু, তার একটা নির্ব্যূঢ় সত্যতা আছে, সে-সত্যতার অনুভব আমি পাই আমার চেতনার গভীরে এক অনির্বাণ জ্যোতির উদ্ভাসে ।

সে যেন অরোরার আলো । আছে যেমন পৃথিবীর সুমেরুতে, তেমনি তার কুমেরুতে । অস্তিত্বের দুটি প্রান্তে সে ঝলমল করছে । তার মধ্যে কোনও দ্বৈতের আভাস মাত্র নাই ।

এই নির্ভেদ অদ্বৈতকে আমি মৃত্যু ছাড়া আর-কিছুই ভাবতে পারি না । তবে কিনা সে-মৃত্যু ককিয়ে-ককিয়ে মৃত্যু নয়, সে বৈবস্বত-মৃত্যু । আমি ভীত হয়ে তার কাছ থেকে পালাতে চাই না । প্রাঞ্জলি হয়ে তার স্তুতি গাই না, 'স্বস্তীত্যুক্ত্বা' তার মধ্যে ঝাঁপ দিই অহরহ — মহামীনের মত সেই বিশ্বরূপ বৈবস্বত-মৃত্যুর সমুদ্রে তোমায় বুকে নিয়ে ডুব দিই, সাঁতার কাটি, ভেসে উঠি ।।

*

... মনে হচ্ছে আজ নববর্ষ । এ-বছর আমার নববর্ষ বুঝি আর ফুরাবে না । অনন্ত কালের প্রবাহে প্রত্যেকটি বিন্দুই তো নওরোজের দাবি করতে পারে । দেশভেদে কালভেদ আমরাই করছি । নইলে মহাকালের প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জয়িনী শক্তির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে ।

তারই নাম বৈবস্বত-মৃত্যু — যেখানে জীবন আর মরণ একাকার, যার ছোঁওয়া পেলে নচিকেতার কৈশোর আর ফুরায় না ।

*

না, নববর্ষ আমাদের আর ফুরাবে না, এই দেখ না, আজ আবার বিক্রম-সংবৎসরের ১লা বৈশাখ । উৎসব করব না, সর্বাণী ? আলবাৎ করব । সমস্তটা জীবনই যে একটানা একটা উৎসব তাদের কাছে — যারা 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' ।

চমৎকার দুটি বিশেষণ — বিজর, অতএব বিমৃত্যু । জীবন শুরু হয়েছিল কৈশোরের লাবণ্য দিয়ে । লাবণ্যের উপচয় আর থামল না । তাই জরার সংক্রমণও আর হল না । জরা যদি না থাকে, মৃত্যু আসবে কোন্ পথ ধরে ?

অথচ জিজীবিষা তো সব নয় — তার পাশেই রয়েছে মুমূর্ষা । মৃত্যুকে তখন বাধ্য হয়ে বৈবস্বত হতে হবে । জীবন আর মৃত্যু তখন হরগৌরীর মত যুগনদ্ধ ।

*

সচ্চিদানন্দের মহিমার সঙ্গে মাধুরী যদি এসে না মেলে, আমার মন ভরে না । এ-ও জানি, মাধুরী কণ্ঠলগ্না হয় মহিমারও । আর সেই মহিমার প্রতিষ্ঠা অক্ষুব্ধ-স্থিরমানস-তিতিক্ষায় ।

জীবনে-মরণে এই একমাত্র সত্য : ''তিতিক্ষস্ব'' । তিতিক্ষা চরমে উঠবে যখন, যাতনার শেষে দেখা দেবে বৈবস্বত-মৃত্যুর কোটিসূর্যসমপ্রভ অথচ কোটিচন্দ্রসুশীতল যুগনদ্ধতার বিলাস বিবর্ত ।

স্বয়ম্প্রভা সংবিৎএর আলোয় তোমার-আমার বাসর-শয়ন পাতা হল বুঝি আকাশে, সর্বাণী ।।

*

চোখ বুজে দেখ 'উরৌ অনিবাধঃ' অন্ধকার । মহাপরিনির্বাণের একরস-প্রত্যয়ে ডুব দাও । বল, সৎ-এর সীমা আছে, অসৎ-এর কিছুই নাই । শূন্যতার ঐশ্বর্য যেন বৈরাগীর রিক্ততার ঐশ্বর্য — বহুশোভমানা হৈমবতী উমাকে তার কোলে স্বচ্ছন্দে বসিয়ে দেওয়া যায় । তার পরেও অনেকখানি স্বাচ্ছন্দ্য উদ্বৃত্ত থাকে ।

এই স্বাচ্ছন্দ্যটুকুই পরম বিত্ত । বিশ্ব গুটিয়ে আসুক বিন্দুতে । সে-বিন্দুতে আয়তন নাই-বা থাকল, অফুরন্ত শক্তির ধারক বা বাহক হতে তো তার কোনও বাধা নাই ।

পর্বতপ্রমাণ বস্তু-নির্ভার একটি ভাবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক । ক্রমে আয়তন ছোট হয়েও শক্তিতে বা চেতনায় তার মহিমা ফুটুক । ...

অজস্র পরিকীর্ণতা ছড়িয়ে আছে চারিদিকে । তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও । তবেই সে সীমার মধ্যে অসীম হয়ে উঠবে । যা-ই সামনে আসুক-না-কেন, বল 'নেতি' । নেতি নেতি বলে বৃহৎ হও — ব্রহ্ম হও । নেতিই চরম কথা ।

জীবন নেতি, মরণ ইতি । শূন্যতায় সব সমস্যার সমাধান হোক্ ।

*

শরীরে এত যন্ত্রণা, 'তবহু ন নিকসে প্রাণ কঠোর' । অথচ একদিন যে সব-যন্ত্রণার অবসান হবে, এ-ও ধ্রুব সত্য । সেই শেষ মুহূর্তে যদি আত্মমহিমায় ডুবে গিয়ে সব-কিছুর উপরে ভেসে উঠতে পারি, তবেই বৈবস্বত-মৃত্যুতে জীবন সার্থক হবে ।

*

...বুক পেতে দিয়ে আছি । দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় । জল থামবে না, সে শুধু সরে-সরে যায়, তাই-না সে সলিল ।

মনে পড়ছে সহজিয়ার বয়ান :

‘কাম দাবানল, প্রেম সে শীতল,
সলিল প্রণয়পাত্র ।’

সর্বাণী, তোমার সুধার ধারায় আমার সব জুড়িয়ে যাক্ ।

... ...

প্রেম সে শীতলের টিকিটিও দেখতে পাচ্ছি না, কোথাও রুদ্রের খরশ্বাস বয়ে চলেছে সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়ে — তাপ-প্রবাহে মানুষ মরছে ।

বাসনা-কামনা না মিটতেই মরছে । তাই ওদের বড় দুঃখের মরণ । ‘স্বস্তীত্যুক্ত্বা’ মৃত্যুর করাল মুখে ওরা ঝাঁপ দিতে পারছে না । পাশী মৃত্যুকে বৈবস্বত-মৃত্যুতে রূপান্তরিত করতে পারছে না ।

জীবনের প্রথম পর্বটা তাই সবার কাটে রুদ্রের দহনে । রুদ্রের দক্ষিণ মুখ দেখার সুযোগ ক’জনার হয় । অথচ এই শিবও আছেন ।

রুদ্রও আছেন, শিবও আছেন । দুজনে গলাগলি হয়ে আছেন । আবার দুজনকে ছাপিয়ে এমন-একটা কিছু আছে যা অনির্বচনীয় ।

সেই অনির্বচনীয় বাউলের গানে —

‘অচিন পাখি কমনে আসে কমনে যায় ।
তাকে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলে ধরা দেয় না ।’

*

‘রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ।’ ক্লীবের প্রার্থনা । রুদ্র তাতে কর্ণপাত করেন না ।

কিন্তু আমিই যদি রুদ্র হয়ে যাই ? আমার বিশ্বাত্মক সত্তা যদি হয় মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া একটা অগ্ন্যুৎপাত ?

বস্তুত যে-আমি রুদ্রের দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করছি, সেই আমিই তো আবার ‘রুদ্রো জলাষভেষজাঃ ।’ আমিই একাধারে তৃষ্ণার জ্বালা, আবার তৃষ্ণার জলও । দুটি যেখানে এক হয়ে মিশেছে, সেখানে কিছুই নাই । দুয়ের যোগফল শূন্য ।

আর তার নাম মৃত্যু, তার নাম ভালবাসা ।

অহরহ জ্বলছি । তার মধ্যে আছে চেতনার পরম উত্তরণে এক শূন্যতা । ক্ষণ আর অণুতে পরিকীর্ণ বিশ্বকে গুটিয়ে আনলে সে হয় একটি নিটোল সত্তা — একটি অখন্ড বোধ ।

গ্রীষ্মের রুদ্র দহনকে ছাপিয়ে সেই বোধ হতে একটি সুরই ঝরে পড়ছে — ‘ভালবাসি, ভালবাসি’ ।

আর সেই সুরের পিছনে গম্ভীর হয়ে বসে আছে আনন্দ । যে-আনন্দ আত্মসমাহিত, কারও দুয়ারে যে ভিখারী নয় ।

তাই ‘রসো বৈ সঃ ।’

*

আর কিছুই নয় — চাই প্রপঞ্চের উপশম । তার জের টেনে বলতেও চাই না — ‘এবং শান্তং শিবমদ্বৈতম্’ ।

কিছুই না — শুধু বুদ্ধের শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই না ।

স্বয়ংপ্রভার সংবিতে ওই একটিমাত্র শিখা এবং তা অনির্বাণ ।

সে-শিখা জ্বালিয়ে শুধু সব দেখে যেতে হবে । দেখাও একটা ভোগ — কেন না তার মধ্যে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের সূক্ষ্ম একটা বিবেক আছে । ওই দ্বৈতকে ছাপিয়ে অখন্ড একটা অদ্বৈতের বোধ — তার স্বধর্ম হল রস ।

সে-রস স্বয়ং অনাসক্ত থেকেই সব-কিছুর নির্বাহক । কি করে, তা ইন্দ্রিয় দিয়ে দূরের কথা, বুদ্ধি দিয়েও ধরবার উপায় নাই ।

‘শুধু বোধে তার বোধ হয় ।’

*

একটা নির্মম সত্য, মহেশ্বরকেও ভোক্তা হতে হয় । সে-ভোগ একদিকে যেমন কণ্ঠ নীল-করা বিষ, আরেক দিকে উমার অধর-সুধা । দুটি ভোগের একটিকেও প্রত্যাখ্যান করবার উপায় নাই । যে তা পারে, সে-ই মহেশ্বর ।

মহেশ্বরই সত্যকার ভোক্তা, কেন না একমাত্র তিনিই রসিক । তাঁর কাছে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সবই ‘মিঠা লাগতা হৈ ।’

এরই নাম ব্রহ্মাস্বাদ — ব্রহ্মের আস্বাদন বা ব্রহ্ম-কর্তৃক আস্বাদন, যা-ই বল না কেন ।

অসহ্য জ্যৈষ্ঠের খরা — ‘মিঠা লাগতা হৈ ।’ ততোধিক অসহ্য জঠর-যন্ত্রণা — তাও ‘মিঠা লাগতা হৈ ।’

আজ সারা দিনের এই অজপা ‘মিঠা লাগতা হৈ, মিঠা লগতা হৈ ।’

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ।।

আমার অহং ‘মধু’ — তা সুখ বা দুঃখ, যাই হোক না কেন ।

দেহে থেকে ট্যাক্স গুনছি, তা-ও মধু ।

একদিন আর গুনতে হবে না — তা-ও যে মধু ।

ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ।।

আমি মধুচ্ছন্দাঃ ।।

জন্মান্তর-প্রসঙ্গ

অধ্যাত্মজগতের এ-সমস্ত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর যারা পেতে চায়, তিলে-তিলে জীবন দিয়ে নচিকেতার মত মৃত্যুর রহস্য উত্তীর্ণ হয়ে, তবে তাদের জিজ্ঞাসা মিটতে পারে । নইলে সংস্কারবশত আমরা একটা কথা বিশ্বাস করে নিতে পারি মাত্র, তার হয়তো একটা অর্থক্রিয়াকারিতা (প্র্যাগ্‌মেটিক ভ্যালু) আছে এই পর্যন্তই । কিন্তু সত্য জিজ্ঞাসার সত্য উত্তর জীবনে তিলে-তিলে গড়ে ওঠে । একটা বৃহৎ চেতনার অনুভূতির উপর এই সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের ভিত্তি । সে-চেতনার রূপ যদি নিজের মধ্যে ধীরে-ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তবে তা হ'তেই এই জগৎরহস্যকে অবরোহক্রমে আমরা বুঝতে পারি এবং সেই বোঝাতেই যথার্থ সংশয়নাশ হতে পারে । এখান থেকে যদি ওই রহস্যকে ধারণা করতে যাই আরোহক্রমে (বাই মেথড-অব্-ইনডাক্‌শান), তাহলে ঠিক বস্তুটি জানতে পারব না । তখন বৃহৎ সত্যের একটা আভাসমাত্র পাব, তা-ও এখানকার বুদ্ধির পরকলার ভিতর দিয়ে — বিকৃতরূপে ।

আচ্ছা, মানুষ কি চায় ? অসীম জ্ঞান ; অসীম আনন্দ আর এই দেহ-মনের আধারে উপচে পড়ে এমন শক্তি । এটি পাওয়ার জন্য আমাদের পিছনপানে তাকানোর কোনও প্রয়োজন তো নাই । হুঁসিয়ার মানুষ বলবেন, তা আছে বই কি । অতীতের ভুল-চুক খতিয়ে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করতে হবে না ? কিন্তু অতীতের ভুলকে স্বীকার করলেই আসবে অনুতাপ । খৃষ্টধর্মে অনুতাপের একটা খুব বড় স্থান আছে । আমার মনে হয় অনুতাপটা একটা বিকৃত অসুস্থ মনের পরিচয় । সুস্থ মানবাত্মা অনুতাপ করে না, অতীতের দিকে ফিরেও তাকায় না । তার আহ্বান আসছে জ্যোতির্ময় মহাভবিষ্যৎ থেকে । আর সে-ভবিষ্যৎ এই মুহূর্তে এইখানেই পূর্ণ মহিমায় দেদীপ্যমান । এই বর্তমানের অনন্তপ্রসার অসীম ব্যঞ্জনাকে প্রভাস্বর চেতনার অনুভব যদি পেয়ে বসে, কোথায় থাকে জন্ম কোথায় থাকে মরণ — কোথায়-বা থাকে জন্মান্তর ! হৈমবতী উমার মতই তুমি বলতে পার, 'ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ ।' এইখানেই যদি জানলে, তবে সত্য আছে । যদি এখানেই না জানলে, তবে আছে মহাবিনাশ । সে-বিনাশেও অন্ধ হয়ে আমি টিকে থাকব, এ শুধু মূঢ়ের সান্ত্বনা, একটা অবুঝ জীবনাসক্তি । বিরাটের কাছে তার সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের কাছে নাই ।

অতএব, সামনে শুধু এগিয়ে যাব এই প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষাই যদি তোমার মধ্যে জ্বলে ওঠে, তাহলে তথাকথিত জন্মান্তর স্বীকার করবার কিছুই দরকার নাই । বরং অধ্যাত্মজীবনে এই স্বীকৃতি অনেক সময় নিয়ে আসে একটা মূঢ়তা, নিয়তির কাছে একটা অন্ধ আত্মসমর্পণ । হ্যাঁ, তোমার জন্ম হতে পারে বটে ; কিন্তু বারবার এই জগতেই ফিরে আসতে হবে, তার কি কোনও অর্থ আছে ? জীবনের প্রতি প্রভাতে যে-অরুণোদয় হচ্ছে, সে কি একটা যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি মাত্র ? যে-দিনটি আজ চলে গেল, কাল প্রভাতে কি আবার সেই দিনটিতে ফিরে যাব ? কিছুতেই তো নয় । প্রকৃতি চলেছে প্রতি পদক্ষেপে অসীমকে জিনে নিতে — জয়ন্তী সে । তার দক্ষিণ চরণন্যাসে নবীনের অভ্যুদয় — তাকে জন্ম বলতে পার, কিন্তু পুনরাবৃত্তি নয় ; তার বামচরণের প্রতিষ্ঠায়

মৃত্যু, পিছন থেকে যা আনছে নবীনের প্রেরণা । আবার পরমুহূর্তেই অদিতির প্রাণশক্তিতে সেই মৃত্যুই হচ্ছে পুরোধা, নবজন্মে হচ্ছে রূপান্তরিত । কিন্তু জয়ন্তী এগিয়ে চলেছে, জীবন-মৃত্যুর ক্রমিক বিন্যাসে কেবলই সে এগিয়ে চলেছে । মৃত্যুতে তার অহংএর বিলুপ্তি নাই । যে-আমিত্বের নিগূঢ় আস্বাদনে আজকার এই মুহূর্ত তার মনে হচ্ছে অমৃতময়, সে-আমি যে আরও সার্থক আরও সুন্দর আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ফুটতে চলেছে । সত্তার অন্তরালে একবারও কি অনুভব কর না সেই চিরন্তনীকে, কবি যার বন্দনায় গাইছেন — 'অনন্তরসলোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা ক্কচিৎ আকাশ ক্কচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে ।' সেই মাহেশ্বরী-চেতনায় আপ্লুত আবিষ্ট নিমজ্জিত বিদীর্ণ বিকীর্ণ হও ! জন্মান্তর হ'ক অনন্ত রূপায়ণের লীলা, অনুভবের ত্রিবেণীসঙ্গমে জীবনমরণের গঙ্গা-যমুনা এসে মিলুক সরস্বতীর অমৃতধারায় !

এই ভূমিকা থেকে দেখ জীবনকে, দেখ মরণকে । চেতনার বিস্তার ঘটুক । অন্তহীন নীলাকাশের তলে এসে দাঁড়াও : ওই নীল রূপ মৃত্যুর রূপ না অমৃতের রূপ ? ওই আকাশ সর্বতোব্যাপ্ত হয়েও সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে । তার বুকে কত ফুল ফুটছে, কত ফুল ঝরছে । সে কি শুধু নির্বিকার ? ফুলের আনন্দ ফুলের দীর্ঘশ্বাস দুই-ই কি তার প্রাণেই প্রাণ পায়নি ? ক্ষণেকের দুঃখটাই তো সব নয়, ক্ষণেকের সুখটুকুই তো সব নয় — দুই-ই অসীমের ব্যঞ্জনা, অতএব তার মধ্যে দুই-ই সার্থক । 'ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমৈব সুখম্' — এই অনুভব চেতনায় আরূঢ় হলে জীবন-মরণের রূপান্তর ঘটবে, সমস্তই হবে অখন্ড অমর প্রাণের লীলা । তার মধ্যে জন্মান্তর একটা হিল্লোলমাত্র — সাবিত্রজ্যোতির তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণ ।

এইদিক থেকে যদি বিচার কর, তাহলে এক হিসাবে জন্মান্তর আছে, আরেক হিসাবে নাই । আমাদের বর্তমান চেতনা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ । গতানুগতিক জীবনের দৈনন্দিন ক্ষুধার তাড়নাকে অতিক্রম করে বেশীদূর সে দেখতে পায় না । তাই সদ্যঃপরিচিত পরিবেশ হতে আরেকটা নতুন পরিবেশ কল্পনা করতেও সে ভয় পায় । এখানকার জীবনের সঙ্গে কি করে যেন সে নিজকে জড়িয়ে ফেলেছে । এর সঙ্কীর্ণতাই তার কাছে এত একান্ত হয়ে দেখা দিয়েছে যে তাকে ছেড়ে যেতে তার সাহস হয় না । এই ভয়ই যদি আমাদের মনুষ্যত্বের চরম সীমা হত, তাহলে মানুষের মধ্যে জান্তবতার ঊর্ধ্বে যে আর-কিছুর বিবর্তন ঘটেছে, তা বলতে পারতাম না । ভয়ে প্রাণ আঁকড়ে থাকা তো মানুষের ধর্ম নয় । পশু না বুঝে প্রাণ আঁকড়ে থাকে, আবার না বুঝেই মরে । কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আত্মবিসর্জন করে । সে-আত্মবিসর্জনের মূলে যে-প্রেরণা, তা কি তারই একটা বৃহত্তর সত্তার অনুভব থেকে আসছে না ? আর এই বৃহতের অনুভব যদি একবার তার মধ্যে জাগে, কোথায় তার সীমা রচনা করা যাবে বল ? জন্মান্তরের কথা এইখানেই আসে — বৃহতের চেতনা থেকে । তা-ই থেকে আসে অমৃতের অনুভব । এই জড়জগৎটা কোন রকমে অনন্তকাল টিকে থাকবে এটাই যদি আমাদের কল্পনায় আসে, তাহলে চিজ্জগৎটাই-বা থাকবে না কেন ? আর যদিই-বা থাকে, তাহলে অহং-রূপে থাকবে না কেন ? যদি সে-অহংকে আমার বর্তমান জীবনের সঙ্কীর্ণতা দিয়ে চিহ্নিত করে তাকে অনন্তপ্রসারিত করতে চাও, সে কি সত্য হবে ন্যায্য হবে ? বর্তমানের অহঙ্কারেরও কি রূপান্তর ঘটছে না ? শুধু এলোমেলো রূপান্তর নয়, তার ঊর্ধ্বায়ন ঘটছে না কি ? সেই ঊর্ধ্বায়নে অহং-এর নব-নব রূপে অভ্যুদয় — এই তো জন্মান্তরের এক রূপ । ঊর্ধ্বায়ন সহজ হবে চেতনার বিকাশে । যদি চেতনাকে সঙ্কীর্ণ করে রাখি অথচ ঊর্ধ্বায়নের বেগ আমার অহংএর পিছনে সঞ্চিত থাকে, তাহলে একটা চক্রকের আবৃত্তিই স্বাভাবিক

হবে না কি ? আমাদের দেশে বর্তমানে জন্মান্তর বলতে আমরা এই চক্রকারবৃত্তিই বুঝি । কিন্তু বেদ বুঝতেন ঊর্ধ্বায়ন । চক্রকাবৃত্তি একটা সত্য হতে পারে, তবে তা-ই একমাত্র সত্য নয় । মানুষের অভীপ্সার সঙ্গে যোগ রেখে আমি ঊর্ধ্বায়ন-রূপ জন্মান্তরই স্বীকার করি — পিছনদিকে তাকাতেও চাই না, চক্রাকারে ঘুরতেও চাই না । আপাতত এইটুকু জানা আমাদের প্রয়োজন । এর চেয়ে বেশী যদি জানতে চাও অর্থাৎ বাস্তবিকই জন্মান্তর আছে কিনা যদি প্রশ্ন কর — বলব আছে, অতীতও আছে । কিন্তু সে কথা জেনে কারও কোনও লাভ হয় না ।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারি — না, অতীতের সে-আর্তি বর্তমানে আর নাই । চেতনার প্রসারে তা মিটে গেছে । যাকে খুঁজেছিলাম তাকে পেয়েছি, কিন্তু এক অনির্বচনীয় রহস্যরূপে । মানুষের মধ্যে সে যেন থেকেও নাই । স্পর্শ-জ্যা যেমন একটা বৃত্তকে একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে অনন্তে উধাও হয়ে যায়, তেমনি একেকটি মানুষকে ছুঁয়ে সে যেন অনন্তে মিলিয়ে যায় । কেন যে আর্তি জেগেছিল, আর অন্যের বুকেই-বা কেন জাগে তা জানি । প্রকৃতির একটা মহা-বিবর্তনের এই ইঙ্গিত । আর্তিরূপে নয়, হোমশিখারূপে আজও একে হৃদয়ে বহন করে চলেছি — অনন্তকাল ধরে চলব । অনন্ত জন্মান্তরের সম্ভাবনায় আমি উল্লসিত । কিন্তু আরেকদিক দিয়ে মনে হয়, আমি নিঃস্তব্ধ : যাকে খুঁজেছিলাম, পরিপূর্ণরূপেই তাকে পেয়েছি, কিন্তু দেখাতে তো পারব না । আমারই একেকবার ইচ্ছা হয় চোখ মেলে তাকে দেখি । কিন্তু জানি, দেখলেই আবার চোখ বুজব ।... নিতান্তই হেঁয়ালি সৃষ্টি করলাম । কি করব, উপায় নাই ।

*

জন্মান্তর যদিও-বা সত্য হয়, তবুও ওটা মেনে নিলে অধ্যাত্ম-সাধনার পক্ষে যে বিশেষ-কিছু সুবিধা হয় তা নয় । জগতের দুটি বড় ধর্ম ইসলাম আর ইসাহী জন্মান্তর মানে নি । কিন্তু তা-সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বড়-বড় ঋষির আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে । আমরা যে জন্মান্তর মানি, তা কতকটা শ্রুতি-পরম্পরায় । তারপর 'পাপের ফলে দুঃখ পুণ্যের ফলে সুখ' এই লোকাতত ধারণাকে কার্য-কারণবাদের যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে গিয়ে জন্মান্তরে বিশ্বাসকে টেনে এনে বুদ্ধির একটা মূঢ় সান্ত্বনা-মাত্র খুঁজি । সুতরাং 'আমি এজন্মে অধ্যাত্মচর্চা না করলে একটা জন্ম বৃথা যাবে, অতএব আমার অধ্যাত্মচর্চা করা উচিত', এ-অজুহাত যথেষ্ট যুক্তিসহ নয় । জন্মান্তর স্বীকার না করেও অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে কোনও যুক্তি আছে কি না, আমাদের তা-ই দেখতে হবে । কেনোপনিষদ বলছেন, 'ইহ চেদবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ' — এই-দেহে এই-জীবনেই যদি কেউ সত্যকে জানতে পারে তবেই সত্য আছে, আর এ-জীবনে যদি কেউ না জানতে পারে তাহলে আছে 'মহতী বিনষ্টিঃ' । এই হচ্ছে বীরের কথা । এ-জন্মেই যদি সত্যকে উপলব্ধি না করতে পারলাম তবে আগামী জন্মের জন্য তাকে তুলে রাখার মধ্যে কী সান্ত্বনা আছে ? এমনও তো হতে পারে যে, জন্মান্তর একটা অসার কল্পনা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেবল মহাবিনাশ ?

অধ্যাত্মজীবনের প্রেরণা আর্টের প্রেরণার মত । একটা জন্মকে মেনে নিয়ে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সামঞ্জস্য রেখে জীবনকে যে ভোগ করতে চাও, তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকতে পারে না । একথাও বলতে পারতে 'প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সামঞ্জস্যেও আমার প্রয়োজন নাই — আমি চাই প্রবৃত্তির

সুষ্ঠু চরিতার্থতা।' কোনও প্রবৃত্তি তো নিন্দনীয় নয়। সমাজ নামে একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা আমরা খাড়া করেছি বলে ক্ষেত্রবিশেষে কোন-কোনও প্রবৃত্তি নিন্দনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে, তাইতে আমাকে নিবৃত্তির লাগাম কসতে হয়। নতুবা একটি সুস্থ পশুর পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরা জীবন যে-কোনও মানুষের কেন কাম্য হবে না? ...

আমার কাছে আর্টের প্রেরণা আর ধর্মের প্রেরণা মূলত একই বলে মনে হয়। দুই-ই জীবনের প্রতি একটা সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। দৃষ্টিভঙ্গির অদল-বদলে বাইরের জগতের যে-ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে, তা সহজে ধরে পড়ে না। ...

দৃষ্টির প্রসারের একটা তারতম্য আছে। সম্ভবত সেটা প্রত্যেকের সহজাত। ... যাকে আমরা অধ্যাত্মজগৎ বলি, তার মধ্যেও এমনতর দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য আছে। ... কিন্তু কথা হচ্ছে কি, কোনও একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে জীবনের চরম তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া প্রাণের ধর্ম নয়। প্রাণ কেবলই চাইছে প্রসারিত হতে। বেদের ভাষায় 'সোমস্য জিহ্বা প্র জিগাতি চক্ষসা' — অমৃতের পিপাসা সমুখপানে ছুটে চলেছে দিব্যদর্শনের সংবেগে। 'ন হি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ' — যা পেয়েছে তা-ই নিয়ে তৃপ্ত থাকতে মানুষ পারে না। এই যে অতৃপ্তি, আত্মস্ফুরণের জন্য এই যে পরম ব্যাকুলতা — এরই নাম অধ্যাত্মপিপাসা। এ-পিপাসা সবার মধ্যে আছে — কোথাও তা সুপ্ত কোথাও-বা প্রকট। বর্তমানে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করে আমরা যে-সমাজবিধান তৈরী করেছি, তা-ও অতীতের অধ্যাত্মসাধনারই ফল। বহু ব্যক্তি হয়তো এই অনুপার্জিত উত্তরাধিকারকে ভোগ করেই তৃপ্ত থাকবে। বাজশ্রবসের মত তারাও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করছে, কিন্তু প্রাণের প্রসার ঘটাতে পারছে না বলে সে-যজ্ঞ তাদের অমৃতের আধিকার দিচ্ছে না। এদের মধ্যে কেউ হয়তো নচিকেতার মত একটা তীব্র অভীপ্সা নিয়ে বর্তমানের গন্ডি পেরিয়ে বেরিয়ে পড়ে, মৃত্যুর মুখামুখি হয়ে তাকে প্রশ্ন করে, 'এই জীবনই কি শেষ, না তার পরেও কিছু আছে?' এই যে বর্তমানের গন্ডিকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রেরণা, সমস্ত আর্টের মধ্যেই এই প্রেরণা কোন-না-কোনও আকারে নিহিত থাকে। যেখানে এই মুক্তির প্রেরণা আত্মপ্রসারের প্রেরণা বড় হয়ে দেখা দেয়, সেখানে বড় আর্টিস্টের জন্ম হয়, বড় অধ্যাত্মরসিকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু সে-দুঃখ নিশ্চয়ই ভোগ-বঞ্চনার দুঃখ নয়। সে-দুঃখ সৃষ্টির দুঃখ। অভিনবকে জন্ম দিতে গিয়ে এই প্রসব-বেদনার মর্মান্তিকতা সমস্ত মহাপ্রাণকেই সইতে হয়। একটা জন্মই তখন প্রসারিত হয়ে সহস্র জন্মের বিপুল অবকাশ রচনা করে। সে-মহাপ্রাণের কাছে আবার জগতে আসা-না-আসার প্রশ্নই জাগে না — অনন্ত প্রাণের অপরোক্ষ অনুভূতিতে এই দেহেই সে অমর।

*

... অনেক দার্শনিক মন্ডূক-কল্পনায় মর্ত্য আয়ুষ্কালকে বাড়িয়ে অনন্তকালে (এ-ও একটা ফাঁকা বুলি, একটা নেগেটিভ আইডিয়া মাত্র) পরিণত করে একটা তৃপ্তিলাভ করে। তাদের মধ্যে কোনও-কোনও মন্ডূক ''বর্ধমান'' আয়ুকে খন্ডে-খন্ডে 'কাটোয়া' করে তাকে নাম দেয় জন্মান্তর। কেউ-বা মরবার পর শরীরটাকে কবর চাপা দিয়ে একটা লম্বা ঘুমের আয়োজন করে এই ভেবে যে, একদিন মহাভৈরব শিঙা ফুঁকে তাদের জাগিয়ে ইত্যাদি। ... পরের কল্পনাটা তো জানই। কিন্তু

ওমরের মত আমার ভাল লাগে নগদ কারবার । জন্মান্তরের কল্পনা আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন । কোথা থেকে এসেছি তা আমি জানি না, কিন্তু জানেন পুরাণকার বা তত্তুল্য কোন নবীন গঞ্জিকাসেবী — এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয় । কোথায় যাব তা-ও জানি না ; পুঁজি এই বর্তমান আয়ুষ্কালটুকু । 'আমার' ক্রমবিকাশ এইটুকুর মধ্যে হচ্ছে এবং তার গতিবেগকে বাড়াবার জন্য আপ্রাণান্ত চেষ্টা করে আমার তৃপ্তি — এইটুকু আমি বুঝি । চেষ্টার চোটে অকালে ফেটে যাই যদি, তাতেও দুঃখ নাই । একটা চরম বিস্ফোরণের প্রত্যাশাকে কল্পনায় রঙিন করে রেখেছি ; তার নাম দিয়েছি 'মহামরণ' — ঠিক সূর্যাস্তের সমারোহে আকাশ রাঙিয়ে দেবার মত ।

এইটুকু প্রত্যক্ষ । বাকীটুকু কল্পনা, কিন্তু কল্পনা করে সুখ আছে (দুঃখও আছে), জোরও পাওয়া যায় । নিরেট প্রত্যক্ষ নিয়ে মানুষের দিন চলে না ; তাই সে কল্পনায় মুক্তি চায় । কিন্তু কল্পনাকে যাচাই করবার অধিকার প্রত্যেকের নিশ্চয় আছে । আমার ক্রমবিকাশ সত্য ; জগতেরটা সত্য কি মিথ্যা ?

*

জন্মান্তরবাদের সত্যতা সম্বন্ধে — নিজের এবং পরের — দুদিক থেকেই আমার মনে কোনও সংশয় নাই । তবু দার্শনিক বিচারের বেলায় জন্মান্তরকে তফাতে রাখি কেন, তার কারণ আছে । প্রথম কথা, মানুষের অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস অপরিহার্য বলে আমি মনে করি না । হিন্দু ছাড়া পৃথিবীতে জন্মান্তর মানে এমন কেউ নাই (অবশ্য বৌদ্ধদের আমি হিন্দুর মধ্যেই ধরি, তাহলে হিন্দু না বলে বলা উচিত 'আর্য') । অনার্য-ধর্মে জন্মান্তর স্বীকার না করেও মানুষ আত্মোন্নতির চরমে উঠেছে । বরং অনেক সময় জন্মান্তরবাদ নানা ছেলেমানুষী কল্পনার প্রশ্রয় দিয়ে অধ্যাত্মপ্রগতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছে, এ-ও দেখেছি । ... অধ্যাত্মসাধনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে, আমি আরেক জন্মে ছিলাম এবং পরের জন্মে থাকব, এ-দুটা কল্পনাই অবান্তর । হাতের সামনে আছে এই একটা জীবন, তার স্মৃতি এবং সমস্যা, আর সেই সমস্যা পূরণ করবার একটা দুর্মর তাগিদ । আমার মাণ্ডূক্য-ব্রহ্মবাদ বলে, আমার কর্তব্য বর্তমানে পাওয়া এই জীবনকে বিস্ফারিত করা । এই করতে গিয়েই অধিকাংশ মানুষ — বোধ হয় শতকরা ৯৯.৯৮জন হিমসিম খেয়ে যায় । তাদের আবার কল্পনার পাখায় অবান্তরের আকাশে ওড়বার শখ কেন ? এ-জীবন একটা বীজের মত । সে মাটিতে পড়েছে ; এখন প্রাণের অন্তর্নিহিত ধর্মের বেগেই সে ফাটবে গজাবে ফুটবে ফলবে । সে কোন্ গাছের বীজ এবং সেই গাছের জনক-বীজের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক এবং তার নিজের পুত্র-বীজের সঙ্গে তার ভাবী জন্মেরই-বা কি সম্পর্ক, এগুলি ভাবতে যাওয়া তার বর্তমান জীবনের ব্রত-উদ্‌যাপনের পক্ষে খুব প্রয়োজন কি ?

সুতরাং জন্মান্তর-কল্পনাকে আড়ালে রেখে এই জীবনকে নিয়েই 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'র নগদ কারবার শুরু করা যাক । সে-কারবারের লক্ষ্য, মূলধনকে ফাঁপিয়ে তোলা, মাণ্ডূক্য-অহংকারের বিস্ফারণ ঘটানো — প্রাচীন আর্য মণ্ডূকেরা কয়েকটা শ্লোগানে যার মন্ত্ররূপ দিয়ে বলেছিলেন, অহং ব্রহ্মাস্মি, সোহহম্, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি । আরও কল্পনা করেছিলেন, শুধু এই পৃথিবীর কূপে নিমজ্জিত এবং কদাচিৎ প্রসারিত কর-চরণে ভাসমান মানব-মণ্ডূকেরাই যে বর্ষানন্দে অমন শ্লোগান ছাড়েন তা নয় । মহানীলিমার ওপারে, ''পরমে ব্যোমন্'' আছেন এক দিব্য মহামণ্ডূক, যিনি কুক্ষি আধ্মাত করে অনবরত হেঁকে চলেছেন 'অহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়' । তাঁর সেই পরম

নিঃশ্বসিত আর পরমা ব্যাহৃতিই তো আমাদের বেদ ।... অতএব ভাইসব, সেই মহামন্ডূকের, দিব্যব্রতের অনুসরণে তোমরাও জোরসে হেঁকে বল, ''আমরা গজাব, বিপুল হব, বৃহৎ হব, ফাটব, ব্রহ্ম হব !''

এই যে বৃহৎ হবার অথবা মান্ডূক্য ভাষায় ফাটবার তাগিদ, একে সর্বসাধারণ জৈবধর্ম বলতে পারি না কি ? বিস্ফারণের একটা সাধারণ ধারা জৈবজগতে দেখতে পাই বংশবৃদ্ধির আকারে । একটি আদি ও অকৃত্রিম মন্ডূকদম্পতী ব্রহ্মবিদ্যার যে-জৈবসাধনা করেন, তাতে হাজার-হাজার মন্ডূক খানায়-ডোবায় পিল্-পিল্ করে গজিয়ে ওঠে । জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশানে তাদের বংশবৃদ্ধি চলতে থাকে, এতগুলির খাবার জুটবে কি না সে-পরোয়া না করে । ফলে, শুরু হয় স্ট্রাগল্ ফর্ একজিস্‌টেন্স । একদিন সে-স্ট্রাগল্ খতম হয়ে যায় কালের কারসাজিতে : শীত আসে, মন্ডূককূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । বীজ রেখে যায় হয়তো, আবার বর্ষাগমে তাকে অবলম্বন করে শুরু হয় 'ব্রহ্মঘোষ' । লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে হয়তো এই ব্যাপার চলে এসেছে, কিন্তু মন্ডূকজাতির কিছুমাত্র উৎকর্ষ দেখা দেয়নি । মন্ডূকব্যক্তির যদি এর মধ্যে জন্মান্তর ঘটে থাকে বারবার, তারও বিশেষকিছু লাভ হয়েছে কি না বোঝবার উপায় নাই । মোটকথা, জৈবজগতের এই বৃহৎ হবার সাধনাতে সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু গুণ বাড়ে না । এক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্মান্তর সম্ভব হলেও সমীচীন নয়, অন্তত আশাজনক নয় ।

কিন্তু প্রাণের সঙ্গে মন এসে যোগ দেয় যখন, তখন সংখ্যাবাহুল্য কমে গিয়ে গুণের উৎকর্ষ দেখা দিতে শুরু করে অর্থাৎ ব্রহ্মসাধনায় প্রকৃতি ডেমোক্রেসির জায়গায় প্রবর্তন করেন অ্যারিস্টোক্র্যাসি । মন্ডূকেরা যখন মনের পরিধি বাড়াতে গিয়ে দেখে আর দমে কুলাচ্ছে না, তখন ভাবে এই মনের পেট-ফাঁপাকে কায়েমী করবার জন্য প্রাণকেও টেনে লম্বা করা উচিত । প্রাণ তাতে গররাজী নয় । কিন্তু দেহ বলে, এত ঝামেলা আমি সইতে পারব না, এই আমি শুয়ে পড়লাম । প্রাণও তখন হাল ছেড়ে দেয়, কিন্তু মন তার কল্পনা ছাড়ে না । তার কল্পনাবিলাস হতেই অমরত্বের ধারণার উৎপত্তি এবং অমরত্ব আর দৈহ্য ও জৈব-চেতনার যথাসম্ভব বিস্ফারণের কল্পনা । এ-তিনের খিচুড়িতে জন্মান্তরবাদের উদ্ভব । কল্পনাটা অযৌক্তিক নয়, তা আমি স্বীকার করি । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কল্পনা বাস্তব হয় কি কখনও ? অর্থাৎ আমার অনুভবে জন্মান্তর কখনও বাস্তব হয়ে ওঠে কি ? যেমন নাকি আমার এই জীবনে বর্তমানের অনুভবে অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দুই-ই অন্তরে বাস্তব হয়ে উঠতে পারে ? আমি এ-ও স্বীকার করি, মান্ডূক্য-মনের বিস্ফারণে এমন মুহূর্তও আসতে পারে যখন সহসা চেতনা বিস্ফারিত হয়ে তার জ্যোতির্ময় পরিমন্ডলে অতীত আর ভবিষ্যৎ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে । এই ব্রাহ্মী (অথবা মান্ডূকী) চেতনাতেই জন্মান্তর সত্য । অপরের বেলায় তা আধ্যাত্মিক সত্য নয়, 'ভৌতিক' সত্য মাত্র (যেমন ভূত দেখিনি, কিন্তু বিশ্বাস করি) । আমার স্মৃতি অতীতকে জাগিয়ে তুলতে পারে, আমার কল্পনা ভবিষ্যতের যুক্তিসঙ্গত ছবি আঁকতে পারে । উভয়ত্র আমার লাভ এই যে, অতীত আর ভবিষ্যতের জ্ঞানকে আমি বর্তমানের প্রয়োজনে লাগাতে পারি, আমার ব্রহ্মসাধনার পক্ষে তা সহায় । কিন্তু জন্মান্তরে বিশ্বাস তো তেমন করে আমার মান্ডূক্যসিদ্ধির সহায় হয় না । তাই সাধনার গোড়াতেই তাকে একটা মত হিসাবে মেনে নিতে আমার আপত্তি । জন্মান্তরে বিশ্বাস কখন কার্যকরী হবে তার একটা সময় আছে ।

*

... তারপর জন্মান্তরতত্ত্ব সম্বন্ধে । এ তো বোঝ, আমাদের ভাবনা বর্তমানকে আঁকড়ে ধরে থাকে নিশ্চিতরূপে । বর্তমানের সামনে-পিছনে যা, তা আমাদের কাছে আবছা । সেই আবছায়া কখনও স্পষ্ট হয়ে বর্ত্তমানের এলাকায় আসে যখন, তখন আমরা স্মৃতি বা কল্পনার সহায়ে বর্তমানের গন্ডিকে খানিক সম্প্রসারিত করি । এই সম্প্রসারণে 'অখন্ডকালীন ব্যাপ্তি' (continuous duration) খুব কম থাকে । বিশ বছর আগের একটা ঘটনা আজ হুবহু মনে করতেও যদি পারে, তবু বিশ বছর আর আজকের মধ্যে যে-ব্যবধান তা কিন্তু নীরন্ধ্রভাবে ভরাট হয় না । হাজার চেষ্টা করেও জীবনস্মৃতিকে আমরা অখন্ড ধারায় প্রবাহিত করতে পারি না, শুধু টুকরা-টুকরা ঘটনার মালা গেঁথে যেতে পারি মাত্র — যার দুটি দানার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক । অতীত-সম্বন্ধে এই কথা, ভবিষ্যতের ছবিটা আরও গোলমেলে । কল্পনা সেখানে আকাশের গায়ে মেঘের আল্পনা — একদন্ড স্থির থাকে না, একটা সুস্পষ্ট আকারও নেয় না । কঠোর বাস্তবের দৃষ্টিতে আমাদের স্মৃতি আর কল্পনা দুই-ই এমনিতর অনির্ভরযোগ্য যদিও, তবু ওদের একেবারে ফেল্না বলতে পারি না । বাস্তবের বদ্ধমুষ্টি হতে ওরাই আবার আমাদের মুক্তি দেয় । সামনে-পিছনে একটুখানি তাকাতে না পারতাম যদি, তাহলে আমাদের পশুত্ব কখনও মানবতার পর্যায়ে উঠতে পারত না । ইন্দ্রিয়সংবিৎ নিরেট, অতিবাস্তব, বর্তমানের পাকা শীলমোহর তার গায়ে ; কিন্তু ভাব স্বচ্ছন্দ । স্মৃতি বা কল্পনারূপে কালের বুকে পক্ষবিহার করবার অধিকার তার আছে, অনেকখানি কালব্যাপ্তিকে (duration) একটি মুহূর্তের বেষ্টনীতে বন্দী করে তাকে বাস্তববৎ প্রত্যক্ষ করবার কৌশল সে জানে । জীবনদর্শনের সার্থকতা এই ভাবের মুক্তিতে । সে আমাদের বর্তমান জীবনে কি দিয়েছে তা যদি তলিয়ে বুঝি, তাহলে জন্ম-প্রাক্তন ও মরণোত্তর অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের অধিকার কতটুক তা আবিষ্কার করতে পারব ।

*

আনন্দ অকারণ, এটা সত্য কথা । কিন্তু টেঁকে না যে সেটা আরও মর্মান্তিক সত্য । আনন্দ থাকে না এই দেখে কেউ যদি আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, তাহলে লোকটা হয় বদ্ধ পাগল নয়তো ভগবান । ক্ষণস্থায়ী আনন্দকে চিরস্থায়ী করবার সাধনাই হল মান্ডূক্য-ব্রহ্মবাদের মূল কথা । আনন্দ কোথায় ? না, স্বভাবে । স্বভাব কি ? না, যা সহজ । সহজ কি ? না, যেখানে কিছুই গজায় না ।... বুদ্ধদেব শুনলে খুশী হয়ে বলতেন, গোল্লায় যাবার পথটি আবিষ্কার করেছ তাহলে এতদিনে !

ওই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' — ছেড়ে দিয়ে ভোগ করবে । যতই ছাড়বে, ততই আনন্দ বাড়বে । শেষ পর্যন্ত মহাশূন্য = মহাসুখ ।

আবার দেখ, মান্ডূক্য-ব্রহ্মবাদ আর অকারণ আনন্দবাদে তফাত কোথাও নাই । ... কিন্তু আনন্দ করতে গিয়ে তোমাকে ঠকাচ্ছি, সেটা বুঝতে পারছ তো ?

বর্তমান ক্ষণই আমার কাছে একমাত্র সত্য হতে পারে । এই বর্তমান ক্ষণের যে-চেতনা, তার রসদ খানিকটা জোগায় ইন্দ্রিয়বোধ, খানিকটা জোগায় ভাব (idea) । ভাবে মুক্তি আছে, ইন্দ্রিয়বোধে নাই । ক্ষণে-ক্ষণে ইন্দ্রিয়বোধের সরে-সরে যাওয়া — একে তার মুক্তপ্রবাহ বলতে পারা যায় বটে । কিন্তু এই ক্ষণভঙ্গকে ধরবার জন্য পিছনে একটা ভাবের বনিয়াদ থাকা চাই ।

নইলে মুহূর্তে-মুহূর্তে কেবল ছিটকে পড়া — এতে মানুষ পাগল হয়ে যেত । ভাব ক্ষণগুলির মধ্যে থেকে একটা ক্ষণকে যে-কোনও কারণে বেছে নেয়, তারপর তার উপর অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যের কল্পনা দিয়ে খানিকটা বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে । এ-সৃষ্টি সুখের হতে পারে, দুঃখেরও হতে পারে । সুখ-দুঃখের কথা বাদ দিয়ে বলতে পারি, এ-সৃষ্টি জীবন-দর্শনের একটা পরিচয় । আমি স্বভাবত যা, তারই মগ্নচেতনা দিয়ে আমার ক্ষণাশ্রিত ভাবের জীবনকে অর্থপূর্ণ করি । এ-অর্থ আমার সত্তার অর্থ । অভিমান-অনুযায়ী তার একেক রূপ । কেউ মনে করছে, আমি কবি ; কেউ ভাবছে, আমি দেশসেবক ; কেউ ভাবছে, আমি হরিবোলা । এই যে অভিমান, এ আমার সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার একটা সাঙ্কেতিক রূপ, আমার জীবনসত্তার বীজ । এই বীজসত্তার অঙ্কুরণ হল আমার একটা জন্মের তাৎপর্য । তা-ই দিয়ে আমার অভিমান গড়া । অভিমানের দৃষ্টি বেশীদূর যায় না, তাই স্বভাবতই আমরা একটা জন্মের বেশী দেখতে পাই না । পশুর দৃষ্টার্থ একান্ত সীমিত — কেননা তার মধ্যে প্রাণশক্তি প্রবল, মনঃশক্তি মূঢ় । মানুষের মন জেগেছে, সে-মন প্রাণের তাগিদের বাইরে অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গী ইন্দ্রিয়-প্ররোচনার বাইরেও কিছুটা দেখতে পায় । কিন্তু যা দেখে, তার মধ্যে কতটুকু তার মৌলিক আবিষ্কার আর কতটুকুই-বা যৌথ সংস্কারের ফল ?

*

অল্পদিনের পরিচয়ে কাউকে ভাল লাগলে জন্মান্তরকে তার জন্য দায়ী করলে তো মুশকিল । ভাল লাগার কত কারণ থাকতে পারে । স্বভাব ও রুচির মিল তার মধ্যে একটা । যেখানে চিত্ত বাধা পায় না, সেখানে একটা আকর্ষণ গজানো স্বাভাবিক । তাছাড়া যার ভাল লাগছে, তার মানসিক অবস্থাও এর জন্য অনেকটা দায়ী নয় কি ? জীবনে অনেকবার দেখেছি, ভিতর থেকে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে যখন, তখন কেউ যদি তাকে পূরণ করবার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তবে তার প্রতি তিলপ্রমাণ আকর্ষণকে তালপ্রমাণ করতে আমাদের বাধে না । অতএব ভাল লাগাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য জন্মান্তর ছাড়া কত কারণই তো থাকতে পারে । তবে যদি বল, যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরীণ সম্পর্ক কল্পনা করতে আমার নিজের ভাল লাগে, তাহলে অবশ্য কথা নাই । কিন্তু এর সঙ্গে আমি এইটুকু পাদটীকা জুড়ে দেব : বিড়ালের ইঁদুর ভাল লাগে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে ওদের মাঝে ওই মধুর সম্পর্কটুকু ছিল বলেই ; আবার আমি যে কাউকে দুচক্ষে দেখতে পারি না তার কারণ ও আমার জন্ম-জন্মান্তরের দুশমন, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

... যতই বলি না কেন, জন্মান্তর আমি মানি, কিন্তু সবাই যেভাবে মানে সেভাবে নয় । এ-বিষয়ে উপনিষদের নজির দেখেও একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমার সঙ্কোচ আছে । যন্ত্রের নিয়মটা জড় জগতে খাটতে পারে ; কিন্তু প্রাণ আর মনের জগতে স্বাতন্ত্র্যের জায়গা অনেকখানি । জন্মান্তরবাদকে একটা যান্ত্রিক আইনে পরিণত করবার মূলে আমি সুযুক্তি খুঁজে পাই না ।

কাউকে যদি ভাল লাগে, অমনিই লাগে । ভাল লাগাটাই যে একটা আশ্চর্য রহস্য । আর সেটা সূর্যের আলোতে শিশিরের একটি ফোঁটার মত বর্তমানের একটি বিন্দুকেই এমন উজ্জ্বল করে তোলে যে, তাতেই সমস্ত সত্তা ভরে ওঠে । ওই একটি মুহূর্তের ভাল লাগাতেই সে আমার অনন্তকালের আপনার ; নাই-বা 'অনাদিকালের উৎস হতে যুগলস্রোতে' বয়ে এলাম ! এই

মুহূর্তের গভীরে যদি অনাদি অনন্তকে স্পর্শ করতে পারি, বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের মহাশূন্যতাকে আবিষ্কার করে বিহ্বল হয়ে যাই যদি, সে-রহস্যও কি কম অনির্বচনীয় ?

*

জন্মান্তর আমি কল্পনা করি না, মানি । কেননা ওর রূপ আমি জানি । কেউ যদি জন্মান্তর কল্পনা করে, আমি তখন তা মানি, কি মানি না বলা শক্ত । জন্মান্তরকে মানি না, না মানুষটাকে মানি না — বলতে পারব না ।

কালকে দীর্ঘবিলম্বিত করে তার মধ্যে ঘটনার পরম্পরা গেঁথে অসীমার বুকে মণিহার রচনা করতে পার । কিন্তু ওই মণিদ্যুতি যে আমি খুঁজে পাই অসীমার চক্ষের ঝিলিমিলিতে, তার বক্ষের হারে নয় । একটি বিন্দুতে অনন্তকাল সংহত হয়ে ঝিকিয়ে উঠল । সেই ক্ষণ-শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে জগৎ ভুলে যাওয়া — এও একটা সত্যের দর্শন । তার মোহ নাই, তাই তার অনুরাগে আছে বৈরাগ্যের ধূসরতা । কবে এই ধূসরের প্রেমে পড়েছিলাম জানি না । জানলে আবার কালকে মানতে হয় । তাই চুপ করে থাকি । দেখি প্রত্যেকটি মুহূর্ত পূর্ণ, নিরাসক্ত । বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু স্মৃতিতে গেঁথে রাখবার প্রয়োজন নাই । স্মৃতি নাই, কিন্তু বৈচিত্র্যের বোধ আছে : অদ্ভূত চেতনা । হয়তো শিশুর, নয় তো পশুর, নয় তো দেবতার ।

*

কাল আনন্দময়ীর জীবনী পড়ছিলাম । এক জায়গায় চোখে পড়ল, 'জন্মান্তর আছে । তবে যাদের পূর্বজন্ম-পরজন্ম সংস্কার আছে তাদেরই জন্মান্তর হয় । যাদের নাই, তাদের হয় না । যে যে-স্তরে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেরূপ ভাবই জাগে, সে সেরূপ কথাই বলে' । খুব স্বচ্ছ বুদ্ধির কথা না ?

*

জন্মান্তর সম্পর্কে জল্পনাকে (speculation) আমি অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে অবান্তর মনে করি । আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে বুঝি । আমার ক্ষুদ্র-আমিকে ছাড়তে হবে, আমাকে বৃহৎ হতে হবে — এই প্রেরণা আমার জীবনের মর্মমূলে । একদিন আমি তাঁর মাঝে ফুরিয়ে যাব । যে-মুহূর্তে ফুরিয়ে যাব, সেই মুহূর্তেই অনুভব হবে, তিনি অবিশ্রাম ফুল ফুটিয়ে চলেছেন কেমন করে । সেই ফুলের মাঝে আমিও ফুটেছি, ফুটছি, ফুটবও । এই ফোটার ব্যাপারে একটা ক্ষুদ্র-আমির অনুবৃত্তির কোনও সার্থকতা তখন অনুভব হয় না । অনুবৃত্তি থাকতেও পারে, না থাকলেও ক্ষতি নাই । অনুবৃত্তির কথাটা ভাবাই হল নিজের আমিটাকে জিইয়ে রাখা । তার কিছুই তো দরকার নাই । আমি যখন তাঁর মাঝে ফিরে গেলাম, তখন শুধু তিনিই থাকলেন । আমার দিক থেকে এ ফিরে যাওয়াটা আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা প্রলয় । কিন্তু তাঁর দিক থেকে তো ওটা অফুরন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনা ।

আমি-র একটা দীর্ঘ অনুবৃত্তি থাকতে পারে — যেমন আধিকারিক পুরুষের থাকে । কিন্তু এই অনুবৃত্তিটা গৌণ ব্যাপার । আধিকারিক পুরুষও তাঁরই নিমিত্তমাত্র । তিনিই স্ফুলিঙ্গ-জীব হয়ে আছেন, আবার আধিকারিক দীপশিখা হয়ে আছেন । তাঁর দিক থেকে দেখলে সবই সুমঞ্জস হয়ে যায় না কি ?

*

অনুভব ছাড়া জন্মান্তরের কোনও প্রমাণ নাই । জন্মান্তর না মানলেও অধ্যাত্মসাধনা স্বচ্ছন্দে চলতে পারে । খৃষ্টধর্মে বা ইসলামে জন্মান্তরবাদ নাই ।

*

আমি তোমাকে জন্মান্তর নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছিলাম । এই জন্মটাই সার্থক কর । জন্মান্তর আছে কি না তা নিয়ে speculation করা মূঢ়তা । পরম চেতনায় প্রতিষ্ঠিত না হলে জন্মান্তর আছে কি না বোঝা যায় না । অধ্যাত্মপথে চলতে গেলে জন্মান্তরের কল্পনা অপরিহার্য নয় ।

*

... জন্মান্তরবাদের আলোচনাটা আবার ঘুরে-ফিরে সেই আদি-বিন্দুতে এসে দাঁড়াল দেখছি । আমার মতটা সহজে কেউ নেবে না জানি ; কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না । আমার স্বপক্ষে দুজন দুটি কথা বলেছেন । রামকৃষ্ণদেবকে জন্মান্তর-সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'জানি না বাপু । কি দরকার তোমার ওসব খোঁজে ? এ-জন্মটায় যা করে নেবার করে যাও না' । — আমিও সবাইকে তাই বলি । জন্মান্তর দিয়ে অধ্যাত্মসাধনাকে আমরা নানাভাবে জটিল করে তুলি — তাতে লাভের চাইতে ক্ষতিই হয় বেশী ।... আনন্দময়ীকে জিজ্ঞেস করাতে বলেন, 'যার সংস্কার আছে তারই জন্মান্তর হয়, — যার নাই তার হয় না ।' অর্থাৎ হিন্দুর হয় তো মুসলমানের হয় না । কথাটা কিন্তু ভাববার মত ।

তুমি ঠেকে গেছ সেই ব্যক্তিত্ববাদে এসে । একই প্রশ্নের মীমাংসা সাংখ্যবাদ আর বিশেষবাদ দুই দিক থেকে হতে পারে । আসল সত্যটা হয়তো দুয়ের মাঝামাঝি । তোমাকে Physics থেকে একটা analogy দিই । Light টা wave না particle ? দেখা গেল, তার কতকগুলি ক্রিয়া wave-ধর্মী, কতকগুলি particle-ধর্মী । বৈজ্ঞানিক বললেন, Light তাহলে wavicle ! অর্থাৎ wave-particle দুইই । এটা কিন্তু একটা গুরুতর কথা । আমার আমিত্বটা wave না particle ? আমি যদি energy-ধর্মী হই, তাহলে আমি wave; যদি matter-ধর্মী হই, তাহলে particle । আমার দেহটা matter-ধর্মী ; কিন্তু তাতে প্রাণ-মন-চেতনা energy-ধর্মী । অর্থাৎ আমি নিজে একটা wavicle । আমি যখন শিবোহহং — তখন আমি wave ; যখন জীবোহহং,

তখন particle । শক্তি ও চৈতন্য হিসাবে আমি সামান্যধর্মী wave, আমি এক । আবার আমার হিসাবে আমি বিশেষধর্মী particle, আমি বহুর মধ্যে একজন । এই particle টা wave হতে চাইছে — এইটাই হল সৃষ্টির উজান তপস্যা । Particle যা যা আমার আশ্রয় করে waveএর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে — এইটাই হল জন্মান্তরবাদের ভিত্তি । আমি particleএর এই অভিসারের সত্যতাকে অস্বীকার করছি না । কেবল বলছি, সব particleই যে চরম wave-energy পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য destined, তা নয় । কল্পনা কর, অগুনতি নিঃসাড় particle পড়ে আছে, তারা electrified নয় । একটা electric charge পেয়ে তারা electrifed হয়ে উঠল এবং particle-এর structure অনুযায়ী তারা dynamic হয়ে moveও করতে লাগল towards higher transformation । কিন্তু charge টা switch off করে দিলাম, অমনি সব particle যে যেখানে এসে পৌঁছেছিল, সে-পথে নিয়ে গেল । আর হয়তো ওই particular group এ electric charge switch on করা হল না । ব্যস্ — ওই সব dead particles বেদের ভাষায় 'মৃতান্ড' হয়ে রইল । থাকতে আপত্তিটা কি ? আমার ঘুম যদি না ভাঙে, তার জন্য দুঃখ করতে থাকবে কে, বল তো ? এই তমোগ্রাসকে সাংখ্য বলেছিলেন, তৌষ্টিকতা । আমরা যতই কামনার উত্তাপে ভরে উঠি না কেন, আসলে আমরা তৌষ্টিক । আমাদের পাত্র অতি-সহজেই ভরে ওঠে । তারপর লম্বা ঘুম । জাগবার জন্য কার মাথাব্যথা হয় ? যতক্ষণ জেগে আছি, ততক্ষণই মাথা ব্যথা । ঘুমুলে কোনও প্রশ্নই নাই । মানুষের self-consciousness হচ্ছে distinctive characteristic, যা তাকে সৃষ্টির মধ্যে অনন্য করেছে । কিন্তু যে self-consciousness প্রাকৃত-গুণের ছায়ায় এত বিকৃত যে তার continuityরও কোনও guarantee নাই । অবশ্য এরই মধ্যে দু-চারটি লোক selected । তাদেরই বোধিসত্ত্ব বলে — তারা বিকারের মধ্যে থেকেও আর-একটা সম্ভাবনাকে বহন করছে । কিন্তু সেরকম কয়টি ? আর larva-অবস্থায় তাদের চেনবার উপায়ই-বা কি ? যাক্, কথাটা ঘুরে-ফিরে এক জায়গাতেই আসছে । আশা করি, একদিন আমার standpoint টা তোমাদের কাছে flash করবে । কথাটা occult হয়ে গেল, না ?

স্বর্গ-নরকের প্রশ্নটাও এরই সঙ্গে জড়িত । আমি বলব, খুব sensitive soul ছাড়া মনে করি ও দুটার বালাই অধিকাংশেরই থাকে না । স্বর্গ-নরক ভোগটা মানুষের বেশীর ভাগই হয়ে যায় এপারে । আসলে ওটা সুখ-দুঃখ ভোগের ব্যাপার । আর সে-ভোগটা হয় শরীর দিয়ে — 'শরীরং ভোগায়তনম্' । তোমার উপনিষদই বলছেন, 'অশরীরং বাব সঙ্গং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ' — শরীর গেলে আর প্রিয়াপ্রিয়ের বা সুখ-দুঃখের বালাই থাকেনা । তুমি বলবে, মরলে পরেও শরীর থাকে । কী রকম শরীর ? — স্থূল নিশ্চয় নয়, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর । কি দিয়ে তৈরী ? ভূতসূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি দিয়ে । কিন্তু ঠিক আমায় বলতে পার, ওই আরেকটি elementএর স্বরূপটা কি ? তার অনুভূতিটা কি রকম ? বলতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবে সবাই । তখন কল্পনা করবে ছায়ামূর্তির । অথচ ভূত-তন্মাত্রের অনুভব, ইন্দ্রিয়শক্তির অনুভব এগুলো যোগীর হয় — সবিচার-সানন্দ-সমাপত্তির ভিতর দিয়ে । কিন্তু সে-অনুভব দিয়ে বিষয়ভোগ এই বর্তমানে প্রাকৃত বিষয়ের অনুভবের মতো মোটেই নয় । তাই সে সূক্ষ্মশরীরের অনুভবটাকে চট্ করে প্রাকৃত অনুভবেরই একটা জের বলে সিদ্ধান্ত করে বাহারের স্বর্গ-নরকের কল্পনা করে বসে কি করে ? অথচ ওপারেও একটা ওধরনের অনুভব সম্ভব কিন্তু ।

আসা-যাওয়া মানে পুনর্জন্ম তো ? আমি জন্মান্তরবাদকে খুব একটা আমল দিই না । অধ্যাত্মপথে এগোতে গেলে ও-কল্পনা নিষ্প্রয়োজন । দেখছি, আমার মধ্যে একটা-কিছু আমাকে অনবরত ঠেলছে নিজেকে বৃহৎ করবার জন্য । এটা প্রাণের উল্লাস বলতে পার । একে স্বীকার করে নিয়ে এই একটা জীবনে যতটা পারি করে যাব । না করেও তো উপায় নাই, কেন না ওটা যে আমার প্রাণের তাগিদ । তারপর যখন স্মরণ হবে, তখন ফুরিয়ে যাব, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে যাবে, বুদ্বুদ সমুদ্রে মিলিয়ে যাবে । আবারও যদি বুদ্বুদ জাগে, ঐ যে সেই আগেকার বুদ্বুদ, তার প্রমাণ কোথায় ? আমার 'আমি'টাই কি স্থির একটা কিছু ? আসলে এক মহাসমুদ্র আছে, তার বুকে বুদ্বুদ উঠছে, ভাঙছে । এই বুদ্বুদটাই জীবন, তাকে যতদূর পার আলোয় নাইয়ে নাও, ফেটে গেলে তো সে সমুদ্রই হয়ে যাবে, তাই না ?

*

লেখক-পরিচিতি

শ্রীমৎ অনির্বাণ (পূর্বাশ্রম নাম নরেন্দ্রনাথ ধর ; আবির্ভাব ৮ জুলাই ১৮৯৬, মহাসমাধিলাভ ৩১ মে, ১৯৭৮) —উপলব্ধি, পান্ডিত্য ও রসসৃষ্টির সমন্বয়ে উজ্জ্বল এক অসাধারণ অধ্যাত্মপুরুষ, মরমীয়া, মনীষী, আচার্য, লেখক, প্রবক্তা, কবি — সবার উপরে তিনি ছিলেন এক নিঃসঙ্গ বাউল ।

রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্ত তাঁর মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা' সমস্ত ভারতীয়-সংস্কৃতির একটি নখদর্পণ — গভীরতায়, উত্তুঙ্গতায়, ব্যাপ্তিতে অনন্য । হিমালয়ের বিজনবাসে তাঁর কাছে উদ্‌ভাসিত হয়েছিলেন হৈমবতী — বেদময়ী বাক্‌ । অনির্বাণ দেখেছিলেন বেদ হল ভারতবর্ষের সমস্ত সাধনা ও দর্শনের মূলাধার । তাঁর বাকি জীবন এই সত্য-দর্শনেরই বিবৃতি । এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পান্ডিত্যপূর্ণ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মন্ডিত করে তিনি অনবদ্য গাঢ়বদ্ধ গদ্যে উপস্থাপিত করেছেন 'বেদ-মীমাংসা'-য় — যা বাংলা সাহিত্য তথা পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডারে চিরসম্পদ হয়ে থাকবে ।

এই উপলব্ধিরই প্রতিধ্বনি তিনি শুনেছেন বেদপুরুষ শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine, The Synthesis of Yoga এবং Savitri তে । তাই বেদভাষ্যের সঙ্গে-সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্যরচনাও তাঁর জীবনের মহতী সৃষ্টি — বিশ্বের অনুবাদ-সাহিত্যে যা এক অতুলনীয় নিদর্শন ।

উপনিষদের ভাষ্যকার-রূপেও তিনি অদ্বিতীয় — এক মৌল-মননের প্রভাস্বর প্রবক্তা । উপলব্ধ জীবন-সত্যকে তিনি প্রকাশ করেছেন আচার্যরূপে অজস্র প্রবচনে এবং উপদেষ্টারূপে প্রশ্নোত্তরে ।

শ্রীমৎ অনির্বাণ ছিলেন মুনি ও ঋষির এক আশ্চর্য সমন্বয় । বাইরে শীর্ণ তপস্বীমূর্তি হলেও অন্তরে সর্বদা রসাবিষ্ট ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণপুরুষ ; তাই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে । তাঁর জীবনের সুর ও ছন্দ ছিল বৈরাগ্য আর প্রেম । তিনি মনে করতেন — এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তম শিল্প ।

মাত্র ষোল-বছর বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ, কঠোর ছাত্রজীবন, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.-তে বেদ-বিভাগে প্রথম স্থান লাভ এবং সুদীর্ঘকাল আশ্রম-বাস — এ-সবই তাঁর জীবনের প্রস্তুতি পর্ব । তার পর চৌত্রিশ বছর বয়সে সব ছেড়ে হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে সুতীব্র সাধনায় ব্রতী হন । পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে বহু অধ্যাত্মপিপাসু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন — যাঁদের অন্যতম ছিলেন ভগিনী নিবেদিতার প্রথম জীবনী-রচয়িতা শ্রীমতী লিজেল রেমঁ । তাঁর লেখা To Live Within এবং My Life with a Brahmin Family বই দুটি বহু পাশ্চাত্য অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুকে অনুপ্রাণিত করে ।

শ্রীমৎ অনির্বাণ আমৃত্যু তাঁর দিব্য কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত ছিলেন । কিন্তু জীবনের অন্তিম-পর্বে অকস্মাৎ পতনজনিত আঘাতে দীর্ঘ সাত বছর শয্যাশায়ী থাকলেও তাঁর প্রাণের তারুণ্য কোনো দিন ম্লান হয়নি । দর্শনার্থী, আর্ত ও জিজ্ঞাসু জন তাঁর কাছে পেয়েছেন শান্তি, সান্ত্বনা, সমাধান ও লোকোত্তর মহাজীবনের আশ্বাস ।

এই ভাবেই বৈবস্বত-মৃত্যুর প্রদ্যোতে উদ্ভাসিত হয়ে রইল তাঁর জীবনের অমৃতগাথা —

''আমি জীবনরসিক, কিন্তু জীবনকে আমি জানি মৃত্যুর বুকে বাঁধা ।''

সংকেত-সূত্র

মৃত্যু :

পত্রলেখা (১) — ৯৭-৯৮, ১৪২
পত্রলেখা (২) — ৩৫-৩৬, ৩৬-৩৭, ৪৩, ৮৩-৮৪, ৯৩-৯৪, ৯৫, ৯৫-৯৬
পত্রলেখা (৩) — ৫৩-৫৪, ১২৮
পত্রলেখা (৪) — ১০৫, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৮-১৩৯, ১৪৬-১৪৭, ১৪৭-১৪৮
পত্রলেখা (৫) — ৩২, ৩৩, ৫৬, ৮৭, ৯৪, ৯৬-৯৭, ৯৭, ১০২-১০৩, ১০৪, ১৩১
স্নেহাশিস (অখন্ড) — ৯৩, ৯৯, ১০০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৮, ১৮৫, ২০৩, ২০৮-২০৯, ২১২-২১৩, ২২৭
পথের সাথী (১) — ৭, ৮, ৩৭-৩৮, ৫০, ৫৯, ৬০, ৬২, ৮৩, ৮৫-৮৬, ৯১-৯২, ১১৭-১১৮
পথের সাথী (২) — ১, ৪, ৪, ৪৪, ৪৮-৪৯, ৪৯, ৫০, ৫৪-৫৫, ৬৩, ৯০, ১০৬, ১২৩-১২৪, ১২৪, ১২৬, ১২৭-১২৮, ১২৮, ১২৯, ১২৯-১৩০, ১৩১-১৩২, ১৩২, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০-১৫১, ১৫৫
পথের সাথী (৩) — ১১-১২, ২৪, ৫২, ৬৮, ৬৯-৭০, ৭০, ৯০, ৯২, ৯২-৯৩, ৯৭, ১০২, ১০৩, ১১৩, ১১৫, ১৩২-১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৯, ১৪১, ১৪২, ১৪২-১৪৩
পত্রং পুষ্পম্ — ১০৮, ১১৫-১১৬, ১৭৬, ১৮৪, ১৮৭, ২০৮, ২০৮-২০৯, ২১২-২১৩, ২১৩-২১৪, ২১৪-২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২০-২২১, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩৬-২৩৭, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৯, ২৫৭-২৫৮, ২৫৯-২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭
প্রশ্নোত্তরী — ৪৪
প্রবচন (১) — ১-৪, ৬, ৭-৮, ১৬, ৩১, ৩৭, ৮৭-৮৮
প্রবচন (২) — ১১২, ১২৩
প্রবচন (৩) — ১৪৩
প্রবচন (৪) — ২৬৭-২৬৯, ২৯৬
পথের কথা — ৬৯, ১০৪, ১০৭, ১২৯
পথের দিশা — ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৭৩, ৭৪, ৭৪-৭৫, ১১৩-১১৪, ১৩১, ১৩২-১৩৩, ১৩৩
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে — ১৮, ১২৭-১২৮, ১৪৪-১৪৫, ১৭১-১৭২
উত্তরায়ণ — ১৪৭-১৪৮
পুরূরবা — ২-৩
অপ্রকাশিত পত্র — ৪, ২৬, ৪৩, ৫২
জনৈক অনুরাগীর দিনলিপি থেকে সংগৃহীত

অদিতি — ১১, ১৪, ২৫-২৬, ৫০-৫১, ৫২-৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৫-৬৬, ৭০-৭১, ৭৩-৭৪, ৭৭, ৭৭-৭৮, ৮১, ৮২, ৮৫-৮৬, ৯৪-৯৫, ৯৯, ১০৪, ১০৬, ১১০, ১১০-১১১

জন্মান্তর-প্রসঙ্গ :

পত্রলেখা (১) — ৬২-৬৬, ৬৯-৭১
পত্রলেখা (২) — ৭-৮, ৮-১২, ১২-১৩, ১৪-১৫, ২২-২৩, ২৩-২৪, ৪৪, ৯৮-৯৯
পথের সাথী (১) — ৩৭
পথের সাথী (২) — ৪
আত্মকথা — ২৬-২৮
অপ্রকাশিত পত্র ৫৪

সমাপ্ত